দুই কূল এক নদী

নন্ত সরকার

প্রথম প্রকাশ : ১৭ই আষাঢ়, ১৩৬৩ সন।

প্রকাশনায় : শ্রীমতি প্রণতি সরকার।
ব্লক-এইচ, ফ্লাট-দুই (পুলিস হাউসিং এস্টেট)
৪৯, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-৭০০০১১

মুদ্রণে : ডি, কে, ডিষ্ট্রিবিউটর
এ, পি, সি রায় রোড (তুলসী বাগান) বিরাটী।

প্রচ্ছদ অঙ্কণে : শংকর সেন।

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণে : ন্যাশনাল প্রসেস।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

কালীমাতা পুস্তকালয়
স্টল নং-২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটর্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

উদয় প্রকাশন
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ইউনিভার্সাল বুক ডিপো
৫৭ ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৯, কলেজ রো, কলি-৯

জগবন্ধু লাইব্রেরী (রাণাঘাট)
ও অন্যত্র।

উৎসর্গ ঃ-

শ্রীযুক্ত শঙ্কু মহারাজের
চরণ কমলে।

ভূমিকা

শ্রীনন্তু সরকারের 'দুই কূল এক নদী' উপন্যাসটি পড়লাম। কোথাও কোথাও বড় লেখকের কিছু প্রভাব চিহ্ন থাকলেও লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয়ও আছে যথেষ্ট। বর্তমানে উপন্যাসকে বেশ জটিল করে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'আর্ট' আর্ট'স ফর সেক'-এর অন্তরালে কিছু সমস্যার পঙ্ক ছিটিয়ে দেওয়াও যে হচ্ছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। নন্তু সরকার সে পথে পা দেননি। একটি মিষ্টি গল্প পরিবেশনই ছিল তাঁর লক্ষ্য আর লক্ষ্য ছিল সমাজের দুর্বল মানুষদের প্রতি।

ছোট গণ্ডীর মধ্যেও মানুষ ছোট-খাট আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করতে পারে। নন্তু সরকারের 'দুই কূল এক নদী'র বিনয় তেমনি একটি আদর্শ বেছে নিয়েছে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সে করেনি, সূর্যের প্রদীপ্ত আলোক বিচ্ছুরণের ক্ষমতা তার নেই তা সে জানে; কিন্তু ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপের শিখা জ্বালবার চেষ্টায় কেন সে পিছিয়ে থাকবে? গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বিচিত্র রূপে মাটির প্রদীপ জ্বলুক। গঠনের মুখে তত্ত্ব আলোচনা না করে এবং পঙ্কের সমস্যা না তুলে ছোট ছোট কাজের প্রেরণা জাগিয়ে তোলাই হোক নূতন লেখকদের কাজ: নন্তু সরকাররা এ ধরণের কাজে ব্রতী হলেই দেশের কল্যাণ। কলমে ধার নিশ্চয়ই ভাল জিনিস কিন্তু কলমে মিষ্টতার স্বাদ দেওয়া এবং এ যুগের যুবকদের অপরের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটাও কম কথা নয়।

'দুই কূল এক নদী'র স্বাদ পাঠকরা গ্রহণ করবেন আশা করি।

ইতি—

(ডঃ শান্তি কুমার দাসগুপ্ত)

প্রাক্তন { অধ্যক্ষ: সিটি কলেজ কলিকাতা।
শিক্ষামন্ত্রী: পশ্চিমবঙ্গ। }

: কিছু কথা :

মানুষ সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। সে যেমন সমাজের কিছু না নিয়ে বাঁচতে পারে না—তেমনি সমাজকেও তার দেবার কিছু আছে। এই দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতেই মানব সমাজ উন্নতস্তরে পৌঁছুতে পারে। বিভিন্ন মানুষ তার যত্ন-প্রসূত সেবা দ্বারা এই উদ্দেশ্যই সাধন করে। সাহিত্যচর্চাও এই সেবার অন্তর্গত। বরং বলা যায় এ হ'ল সেবার আর এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। কারণ, সাহিত্যিকের লেখনী চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে মানুষকে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে।

নন্তু সরকার সাহিত্য জগতে একটি অনুজ্জ্বল নাম। পদে পদে বাধা আঘাত ও অবজ্ঞা পাওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চা থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। কর্মময় জীবনের মধ্যে নিরলস সাধনায় তিনি গড়ে তুলেছেন গল্প, উপন্যাস, ছড়া-কবিতা ও গানের এক বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার। এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তাঁর "গোকুলে গোপা" সর্বপ্রথম প্রকাশ করি। বৃহত্তর পাঠক সমাজে তা আদৃত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকার অনুপ্রেরণায় ও অনুরোধে আবার এঁর "দুই কূল এক নদী" প্রকাশ করলুম। এর ভালো-মন্দ বিচারের ভার সেই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের উপরই ন্যস্ত রইল। তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগীতা কামনা করি।

কলিকাতা-১১ ধন্যবাদান্তে—

২রা জুলাই, ১৯৮৬ **প্রণতি সরকার**

বাস্তবের প্রেক্ষাপটে কাল্পনিক চরিত্রের সাহায্যে কাহিনীর প্রয়োজনে উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ দেওয়া বা হেয় প্রতিপন্ন করা কাহিনীকারের অভিপ্রায় নয়—তবুও যদি কোন ক্ষেত্রে তা ঘটে থাকে তাঁর জন্য লেখক সর্বতোভাবে ক্ষমা প্রার্থী।

কলিকাতা। বিনীত—

নন্তু সরকার

দুই কূল এক নদী

এই লেখকের ঃ-

গোকুলে গোপা (উপন্যাস) ১২.

স্নান খাওয়া সেরে যথা সময়ে ষ্টেশনে এলেও নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন না আসায় বিনয়ের কলেজে পৌছুঁতে দেরি হয়ে গেল। দরজার কিছুদূরে থাকতেই ঢং ঢং করে ক্লাস শুরুর ঘণ্টা বেজে উঠল। সে উপায়ন্তর না দেখে দৌড়ে তিনতলার ক্লাসঘরের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল। সে যখন দোতলা থেকে তিনতলায় উঠছে তখনই বিপত্তি ঘটল। হঠাৎ একটি মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আরও কয়েক ধাপ সিড়ি ডিঙিয়ে গিয়ে সে থামল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, আট-দশটা মেয়ে রণমূর্তি ধারণ করেছে। একজন বলে উঠল—ইতর ছোটলোক কোথাকার। অন্যজন বলল—অসভ্যের মতো মেয়েদের গায়ে ধাক্কা না দিয়ে ওরা যেতে পারে না। আর একজন বলল—মেয়েদের গায়ে ধাক্কা না দিলে, টিট্‌কারী না দিলে ওদের পেটের ভাত হজম হয় না!

নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে বিনয় নিচে নেমে গিয়ে যে মেয়েটির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল—আমাকে ক্ষমা করবেন, ট্রেন দেরি করায় এমন বিপত্তি হল।

তপতী কটু কথা যা বলবে ভেবেছিল বিনয়রূপী আসামী তার সামনে এসে দাঁড়ালে সে যেন সব কিছু ভুলে গেল। কোনমতে নিজেকে সে গুছিয়ে নিয়ে বলল—এভাবে না চলে ভবিষ্যতে একটু দেখেশুনে চলবেন, আশা রাখি।

জবাবে বিনয় বলল—নিশ্চয়ই, তবে আপনারাও ভবিষ্যতে এলোমেলো না চলে বিবেচনা করে নিয়ম মতো যে কোন ধার ঘেসে ওঠা-নামা করলে.........

বিনয়ের কথাটা সম্পূর্ণ হতে না দিয়ে তপতীর বান্ধবী তথা

সহচরী কবিতা বলে উঠল—থামুন, বাজে বকবেন না। আমরা কিভাবে চলব, না চলব সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দেব না! আপনার অত বড় বড় দুটো চোখ থাকতেও কেন দেখে চলেন না? দোষ করে আবার লম্বা লম্বা জ্ঞান দিচ্ছেন! ছেলে বলে কি আমাদের মাথা কিনে নিয়েছেন? ভাবছেন, আমরা আপনাদের ভয় করে চলব?

মেয়েটির কথা শুনে এতক্ষণ পরে রাগে বিনয়ের কান দুটো গরম হয়ে উঠল। সে বলল—ভয় করেন কিনা আমি জানতে চাইনি, আমার প্রয়োজনও নেই। তবে ভদ্রতা বলে কথাটার যা ধারণা আছে তার ভিত্তিতে আমার জিজ্ঞাস্য—অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার পরেও কি সভ্য মেয়েদের মুখ দিয়ে ওইসব অশ্রাব্য উক্তি বেরিয়ে আসে? দয়া করে আপনাদের অভিভাবকদের কাছে কথাগুলো জেনে নিয়ে সুযোগ মতো জানালে বাধিত হব। কথাগুলো বলেই বিনয় চলে আসছিল। কিন্তু মেয়েটির মুখের জবাব তাকে দাঁড় করিয়ে রাখল।

কবিতা মুখ ভেংচে বলে উঠল—ইস্‌রে আমার সাধুপুরুষ! তাঁরা বেশ ভালোমতোই জানেন, মেয়েরা ছেলেদের পিছনে লাগে, না ছেলেরা মেয়েদের পিছু ধাওয়া করে!

বিনয় গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করল—আপনি তাহলে সব ছেলেকে জানেন না।

কবিতা ছাড়বার পাত্রী নয়। সে জবাব দিল—ওরে আমার বিড়াল তপস্বী এসেছেন, তোরা সব চিনে রাখ. উনি একেবারেই মাছ খাননা!

কবিতার উক্তিতে তপতীর মুখ লজ্জায় নত হয়ে গেল। সে তার পিঠে একটা কিল মেরে বলল—কবিতা তুই থামবি!!

তপতীর ধমকে কাজ হল। কবিতা চুপ করে গেল। বিনয় আর না দাঁড়িয়ে ক্লাসরুমের দিকে গেল। ক্লাসের সামনে এসে দেখল দরজা বন্ধ। ভেতরে প্রফেসর দত্ত লেক্চার দিচ্ছেন। ইংরাজী পড়াচ্ছেন। তিনি এখন আর কাউকে ঢুকতে দেবেন না। বড় কড়া লোক। ঘণ্টার বাজার সঙ্গে সঙ্গে উনি ক্লাসে ঢোকেন। দ্রুতগতিতে 'রোল কল' করেন। তারপরই দরজা বন্ধ করে দিয়ে পড়ানো শুরু করেন। পড়ানোর সময় তাঁর ক্লাসে কেউ ঢুকতে বা বেরুতে পারে না। বিনয় নিষ্ফল আশায় কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা ছুটো করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে লাইব্রেরীতে ঢুকে "ষ্টেট্সম্যান" নিয়ে পড়ায় মনোসংযোগ করল।

কিছুক্ষণ পরে তপতী তার দলবল নিয়ে সেখানে এসে ঢুকল। বিনয়কে দেখে কবিতা চোখ কুচকে বলে উঠল—আজ ঘুম থেকে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম বলতো!

কার উদ্দেশ্য কবিতার এই মন্তব্য বিনয় তা বুঝতে পারলেও চুপ করে রইল। ভাবল এই অভদ্র মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলার মতো নীচতা আর নেই। সে নির্বিকার চিত্তে খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

বিনয়ের এই মৌনতায় তপতী নিজের ব্যক্তিসত্বায় যেন আঘাত পেল। সে আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠল—কবি, তুই আচ্ছা অসভ্য তো! এখনও আস্তাকুড় ঘেটেই চলেছিস। তোকে সঙ্গে নিয়ে দেখছি শান্তি নেই, এখান থেকে শীগ্গির বেরিয়ে যা! তপতী কবিতার কাঁধে একটা ঠেলা মেরে নিজেই সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যেতে কবিতা সহ অন্যান্য মেয়েরাও তাকে অনুসরণ করে লাইব্রেরী ত্যাগ করল।

আরও কিছুক্ষণ কাগজ পড়ার পর ক্লাস সমাপ্তির ঘণ্টা শুনে

বিনয় উঠে নিজের ক্লাসঘরের দিকে চলল। কিন্তু আজ অন্যান্য কোন পিরিয়ডেই তার মন বসছে না। অথচ বন্ধুবান্ধব কারো কাছে এই ঘটনা প্রকাশ করে নিজেকে ছোট করতেও তারবিবেকে বাধছে। কলেজ ছুটির পর ট্রেনের পথ; আড়ংঘাটা নেমে আধমাইল পায়ে চলা পথ অবধি নিভৃত অপমানের গ্লানি তার অন্তরকে বারবার দহন করে চলেছে। বাড়ি ফিরে প্রাত্যহিক নিয়মে সে চুর্ণীর তীরে এসে বসেছে। কিন্তু অন্যদিনের মতো ওপারে বাবলা বনে অস্তগামী সূর্য্যের লুকোচুরি খেলা আজ তাকে তেমন করে ভাবের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারছে না। গোধূলি আকাশের বর্ণাঢ্য শোভা কখন যে আঁধারের অন্তরালে হারিয়ে গেল তা সে জানতেই পারল না।

বাড়ি ফিরে শুনল, আরতির মাষ্টার তাকে গান শেখার তালিম দিচ্ছে। বিনয় আজ আর টিউসানিতে যাবার কোন তাগিদ পেল না। পিসিমার দেওয়া চায়ের কাপ নিঃশেষ করে বারান্দায় তক্তপোষের উপর বসে গান শুনতে লাগল।

প্রভু মিনতি তব পায়
বিপদে আপদে তুমি থেকো সহায়।।
কঠিন এ মায়ার সংসার,
পদে পদে বাধা, ব্যথা পারাবার,
সে সব লঙ্ঘিতে তুমি
অভয় দানিয়ো আমায়।।

তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে গানের কথাগুলো প্রবেশ করে উপলব্ধির সর্বস্তরে ছড়িয়ে গিয়ে অনুভূতি-জগতে স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে।

২

মাস খানেক পরের কথা। সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই তপতী চোখ মেলে দেখল, কবিতা ঘরে এসে বসে আছে। গতকাল একটু বেশি রাতে শুয়ে তার ঘুম ভাঙতে এমন দেরি হয়েছে। এখনও চোখের ঘুম যেতে চাইছে না। সে এপাশ-ওপাশ করে একবার হাই তুলে জিজ্ঞাসা করল—কখন এলি ?

কবিতা টেবিলে রাখা মহাকাশ পাত্রিকার পাতা মুড়ে জবাব দিল—আমি সেই সাড়ে ছ'টা থেকে কতবার ডাকাডাকি করছি, কিন্তু তোর আর ঘুম ভাঙছে না। এত বড় একটা কাজের দায়িত্ব মাথায় থাকতেও তুই কি করে যে এমন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারিস আমি ভেবেই পাচ্ছি না !

তপতী পাশ ফিরে কবিতার বিপরীত দিকে মুখ করে শুয়ে আর একবার হাই তুলে বলল—তোরা থাকতে আমার আবার ভাবনা কিসের বল ? তারপর সে উপুর হয়ে পাশ বালিশ চেপে ধরে সমস্ত অসার আলস্য তাড়িয়ে হাঁক দিল—ও পিসি, দু'কাপ কফি দিয়ে যাও তো।

এ বছর শীতটা বোধ হয় বেশি পড়বে। তার শুভ বার্তা যেন কার্তিকের এই শেষ সপ্তাহেই জানিয়ে যাচ্ছে। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্য্যের বাঁকা রশ্মি বিছানা ও ঘরের মেঝেয় পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। তপতী আস্তে আস্তে নিজের পরিচ্ছদ ঠিক করে গায়ে কম্বল জড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসল। বলল—এত সকালে তুই এলি কি করে ? তোর শীত করছে না ?

কবিতা সোয়েটারের গলার কাছের বোতাম খুলে দিয়ে জবাব দিল—আমাদের তো ভাই অত শীতকাতুরে হলে চলে না। শীতের জন্য তো আর দরকারী কাজ ফেলে রাখা যায় না। কাল তুই চলে এলে আমি, আরতি, টুনু, সকলে কত খেটেছি জানিস ? আমি আর নন্তু মাইক নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছি।

সমস্ত ছেলেমেয়েকে তোর কথা জানিয়েছি। ইলেক্‌শনে তোর নমিনেশন দাখিল করার কথা শুনে সকলে আনন্দে হাততালি দিয়েছে। আর দেবেই বা না কেন? ছেলেদের কথা শুনেই কি আমাদের চিরকাল চলতে হবে? এবার আমরা-মেয়েরা কলেজ ইউনিয়ন চালাব।

তপতী বলল—তোরা যা করছিস কর, কিন্তু আমাকে নিয়ে এমন মাতামাতি করছিস কেন?

তপতীর কথায় কবিতা রাগ করে বলল—কি সব আজে-বাজে বকছিস তপু, তুই ছাড়া মেয়েদের মধ্যে আর কে আছে যে ষ্ট্যামিনা নিয়ে লড়তে পারে?

—কেন তুই কিংবা আরতি?

—ছ্যাঁ ছ্যাঁ! কার সঙ্গে কার তুলনা করছিস। তাছাড়া জিতলে আমরা তোকেই 'জি, এস' করব। ওই পাড়াগাঁয়ের ভূত বিনয়কে নিয়ে যদি এত মাতামাতি হয়—তবে তোর যোগ্যতা কম কিসে বল তো?

এই সময় দরজায় করাঘাত হল। কবিতা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই আরতি, বুলু, টুলু আর টুলুর ছোড়দা নন্তু এসে ঘরে ঢুকল। তপতী বুঝল সবই কবিতার পূর্ব পরিকল্পনা মতো ঘটছে। তার সকালটা আজ এরা মাটি না করে ছাড়বে না! সকলে বেলা ন'টা পর্যন্ত নানারকম যুক্তি-তর্ক ও আলোচনা করে অবশেষে মাইকভাড়া বাবদ দুশোটি টাকা তপতীর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে তবেই সকলে তাকে নিস্কৃতি দিয়ে গেল।

বিকাল বেলা আজ স্বাস্থ্যের খাতিরে মহিমবাবু গোলায় যাননি। দোতলার ঘরে সোফার উপরে বসে জানালার পর্দা সরিয়ে তিনি একমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তপতী কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। সে বাবার ঘরে গিয়ে মহিমবাবুর পিঠের উপর ডান হাতখানা রেখে জিজ্ঞসা করল— অমন করে কি দেখছ বাবা ?

মহিমবাবু মেয়ের প্রশ্নে হেসে জবাব দিলেন—দেখছিলুম নির্মল আকাশ কেমন নীল দেখায়। সৃষ্টিকে মুগ্ধ করে ধরে রাখে। তুমি এই বুঝি ফিরলে মা ?

—হঁ্যা বাবা। পিসি তোমার জলখাবার দিয়েছে ?

—না. এক্ষুনি দেবে হয়তো। তুমি ঘরে যাও, কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম নাওগে।

তপতী ওঠার কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে বলল—জানো বাবা কি কাণ্ড হয়েছে।

—কী মা ?

—কবিতা, আরতি সকলে জোর করে আমাকে কলেজ ইউনিয়নের ইলেক্‌শনে নামিয়েছে। আচ্ছা বল দেখি এইসব কি আমার পোষায় ?

মেয়ের কথায় মহিমবাবু হাসলেন। এই বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

এইসময় জ্ঞানদা দুই থালায় জলখাবার সাজিয়ে এনে হাসিমুখে তপতীকে বলল—শুধু বাবার আদর খেলেই হবে, না জামাকাপড় পাল্টে পেটে কিছু দিতে হবে ?

জ্ঞানদার কথায় তপতী লজ্জা পেল। নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে এসে বাবার পাশে খেতে বসল।

রাত্রিবেলা শোবার আগে তপতী টেবিল থেকে পুরানো কলেজ ম্যাগাজিনখানা তুলে নিয়ে চোখ বুলাচ্ছে। কিছু পাতা ওল্টানোর পর একটি পাতায় তার দৃষ্টি আটকে গেল। বিনয়ের লেখা প্রবন্ধ "বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও তার ভবিষ্যৎ"। সে লেখাটা মনোযোগ সহকারে পড়ল। এর প্রতিটি শব্দ, শব্দের মর্মার্থ তপতীর মনকে নাড়া দিচ্ছে। সে মনে মনে বলল—ছি! ছি! এর বিরুদ্ধেই আমাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়েছে? সে রাত্রে তপতীর বারবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল।

পরের দিন তপতী কলেজে চলেছে। আজ সে প্রতিদিনের পথ বাদ দিয়ে রিক্সাচালককে জি, এন, পালচৌধুরী সরণী ধরে ষ্টেশনের গাঁ দিয়ে যেতে বলল। রথতলা গেটের কাছে পৌঁছুলে হুস্ হুস্ শব্দ করে বানপুর লোকাল চলে গেল। বাস স্টপেজ ছাড়িয়ে এস, ডি, পি, ও, বাঙলোর কাছাকাছি এসে তপতী দেখল, বিনয় বেশ জোরপায়ে হাঁটছে। সে বিনয়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় বলল—আজও কিন্তু আপনি দেরি করেছেন।

বিনয় হেসে জবাব দিল—কি আর করি বলুন. রেল কোম্পানী তো আমাদের লাইনে প্রয়োজন মতো সময়ে গাড়ি চালাবে না—তবে আজ আর আপনার ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা নেই. কারণ আপনি রিক্সায় আর আমি পদরথে; বরং ইচ্ছা করলে সেদিনের অপূর্ণ প্রতিশোধ আপনি পূর্ণ করে নিতে পারেন।

তপতী জবাব দিল—ছি! ওসব কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। ওরা যা বলেছে তার জন্য আমি দুঃখিত এবং মর্মাহত। আশাকরি আপনার মহৎ হৃদয় আমাকে ক্ষমা করবে।

মেয়েদের দলনেত্রীর পরিবর্তনে বিনয় বিস্মিত হল। সেইসঙ্গে খানিকটা সন্দিগ্ধও। নির্বাচন বানচাল করার কোন

মতলব নিয়ে ও আসেনি তো? সে মনে মনে সতর্ক হয়ে বলল—তপতীদেবী, আপনি অপাত্রে ঘি ঢালছেন—ওসব বিশেষণ আমার প্রাপ্য নয়। আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে আপনার পার্সোনাল ইমেজ নষ্ট করবেন না। আপনার জন্য সব মেয়েরা অপেক্ষা করে আছে, আপনি আর এখানে অযথা সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যান।

তপতী গম্ভীর হয়ে জবাব দিল—দেখুন কোন ঘটনাচক্রে কেউ যদি কাউকে একবার খারাপের তালিকায় নির্দিষ্ট করে তবে তার কোন কিছুই সে ভালো নজরে দেখে না। আর অপেক্ষায় থাকার কথা বলছেন? আমার জন্য শুধু মেয়েরাই থাকবে, কিন্তু যার জন্য ছেলে এবং মেয়ে সকলেইঅপেক্ষায়আছে, তার এভাবে দেরি করে যাওয়া উচিৎ হচ্ছে না।

বিনয় হাত জোড় করে বলল—দোহাই তপতীদেবী, আমাকে এভাবে ব্যঙ্গ করবেন না। আমি আপনার ব্যঙ্গ বা ঈর্ষার কেউ নই, আমি নিতান্তই নগণ্য সাধারণ একজন।

তপতী হেসে জবাব দিল—সত্যিই বিনয়বাবু, আপনার নামটার সার্থকতা আছে। যিনি এ নাম রেখেছিলেন তাঁর দূরদৃষ্টিকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। যাক্ আপনি যখন এতই বিরক্ত বোধ করছেন, তখন আমি চলি। পারলে আপনি বরং একটা রিক্সা নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি আসুন—এটা আমার ব্যঙ্গ নয়, অনুরোধ!

তপতী চলে যাবার পর বিনয় মেয়েটি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে লাগল। কিন্তু শত্রু বা মিত্র কোন দলেই তাকে ফেলতে পারছে না।

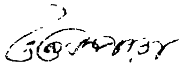
কলেজ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতা তুঙ্গে উঠেছে। পূর্ববর্তী জেনারেল সেক্রেটারীদের কে কোন্ কেলেঙ্কারীতে জড়িত

ছিল, কে কোন্ ভালো কাজ করতে গিয়ে কাদের দ্বারা বাধা পেয়ে সফল হতে পারেনি, সেই সবের চর্বিত চর্বণ ও উদ্গারে ছাত্র-ছাত্রীদের চৈতন্য উদয়ের চেষ্টা চলছে। এই সময় বিনয় গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই সুব্রত ও কয়েকটি ছেলে যেমন খুশি হয়ে উঠল, তেমনি কবিতা, আরতি, নন্তু এরা ভ্রূকুটি করল। বিনয়কে দেখে তাদের বক্তৃতাও শ্লেষের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কবিতা তার বক্তৃতায় বিনয়ের তপতীর সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ব্যাপারটাকে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের অশালীন আচরণের উদাহরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করল। কবিতার পরেই তার অনুরোধে তপতীকে বক্তৃতামঞ্চে উঠতে হল। সে অল্প কথায় বেশ গুছিয়ে বক্তব্য রাখল। তার বক্তব্যের সারাংশ হল, ছাত্ররা যেন কেবল বক্তৃতার জালে বন্দি হয়ে কাউকে নির্বাচিত না করে। প্রার্থীর চারিত্রিক ও ব্যবহারিক গুণাবলীও বিবেচ্য বিষয়। সকলের শেষে বিনয়ের কিছু বলার সুযোগ হল। সে নিজে কখনও ইউনিয়নের নেতা হয়ে ক্ষমতা দখল করতে রাজী হয়নি। কিন্তু যখন দেখল, কতকগুলো খারাপ ছেলে ক্ষমতা দখলের লিপ্সায় মেতে উঠেছে, তখন সুব্রত ও রঞ্জনের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাদের সঙ্গে একরকম বাধ্য হয়েই নমিনেশন জমা দিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য, দলীয় রাজনীতির নোংরা আবর্ত থেকে কলেজ তথা ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করা। বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার সময় বিনয় লক্ষ্য করল, তপতী হাসিমুখে তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করছে। তার আরও মনে হল, তপতী বক্তৃতার সময় তার বিরুদ্ধে কিছুই বলেনি। বরং তার নিরপেক্ষ বাচনভঙ্গীকে বিনয় মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না।

পরেরদিন বেশ আড়ম্বরের মধ্যেই নির্বাচন পর্ব সমাধা হল। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোটপত্র গননা ও ফলাফল নিয়ে বেশ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। নির্দলীয় প্রার্থী বিনয় সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে। জয়ী হয়েছে সুব্রত এবং রঞ্জনও।

তাদের সমর্থনে বিনয় হয়েছে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বা পোষাকী নাম 'জি-এস'। এই ঘটনায় কবিতা বাড়িতে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। তার প্রিয় বান্ধবী জনপ্রিয় নেত্রী তপতীর এমন পরাজয় হবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

অপর দিকে তপতী সেই সময় ঘরে বসে কলেজের পুরানো ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় নিমগ্ন। বিনয়ের যে লেখাগুলো সে সময় অভাবে পড়ে উঠতে পারেনি সেগুলো এখন ঘরে দরজা দিয়ে মুখস্ত করতে বসেছে। নির্বাচনে হেরে তার যেন ক্ষতিই হয়নি। বরং মনে হচ্ছে নব নির্বাচিত 'জি-এস' বিনয়কে গিয়ে বিজয় অভিনন্দন জানিয়ে এলে ভালো হত। কিন্তু তা করতে গেলে প্রিয় বান্ধবী কবিতাকে বড়ই দুঃখ দেওয়া হবে।



৩

কয়েকমাস পরের কথা। বিনয় ইউনিয়নের ঘরে বসে জরুরী কতকগুলো কাজ সারছে। এই সময় প্রিন্সিপ্যাল ভোলানাথবাবু তাকে ডেকে পাঠালেন। বিনয় তাঁর ঘরে গিয়ে দেখল, তিনি সামনে রাখা একটা মোটা খাতার পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মুখ না তুলেই বললেন—একটু ব'সো। ভোলানাথবাবু পিয়ন হরিপদকে ডেকে বললেন—তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, যেন ভেতরে কেউ না ঢোকে। তারপর তিনি বিনয়কে বললেন--এই দেখ এতগুলো "ফ্রি", "হাফ্ ফ্রির" দরখাস্ত জমা হয়েছে। আমাদের কলেজের আর্থিক অবস্থার কথা তো তুমি ভালোমতো অবগত আছ। এখন কাকে বাদ দিয়ে কাকে সুযোগ দেব এই হয়েছে সমস্যা। অথচ "ফ্রি" বা "হাফ ফ্রি" হবে এই আশায় এইসব ছেলেমেয়েরা গত আট ন'মাস

ধরে মাইনে দিচ্ছে না—এদিকে প্রফেসরদের মাইনে দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। আর "ফ্রি" বা "হাফ ফ্রি" ব্যাপারটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উন্নতি হবে বলেও আশা নেই। কারণ যারা আশায় আশায় মাইনে দিচ্ছে না তাদেরকে এইসময় চাপও দেওয়া যাচ্ছে না।

বিনয় দরখাস্তগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। সে আশ্চর্য হল কবিতা বা নন্তু যাদের কোনরকম অভাব নেই তারাও "ফ্রি" হবার জন্য আবেদন করেছে। এটা আর কিছুই নয়—বিনয়কে অপ্রস্তুত করা। কারণ তারা ধরেই নিয়েছে, বিনয় তাদের আবেদনপত্রে সুপারিশ করবে না—আর তা হলেই তার বিরুদ্ধে ওদের অপপ্রচার চালাতে সুবিধা হবে। লেখাপড়ায় ভালো ছেলে হিসাবে বিনয় প্রতিবছরই 'হাফ ফ্রি'র সুযোগ পেয়ে থাকে। এবারও সে আশা করে আবেদন করেছিল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে এখন নিজের দরখাস্তখানা বের করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর কবিতা ও সুব্রতর দরখাস্তে সুপারিশ করে বাকীগুলোর বিষয়ে বলল—স্যার, আপনি অভিজ্ঞ ব্যাক্তি, সকলের পড়াশুনা ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন। আপনিই ঠিক করুন, কাকে কাকে এই সুযোগ দেওয়া উচিৎ—যাতে কেউ না বলতে পারে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছি।

ভোলানাথবাবু ও বিনয়ের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে কলেজ ফাণ্ডের সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের একটা তালিকা প্রস্তুত করা হল। ভোলানাথবাবু বললেন—তোমার দরখাস্তখানা ছিঁড়ে ভালো করনি। এখানে বসেই নতুন করে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে যাও, আমি ওটা "এক্সেপ্‌শোনাল কেস" হিসাবে "ট্রিট্‌" করব।

"এক্সেপ্‌শোনাল" কথাটা বিনয়ের কানে খট্‌ করে লাগল। সে বলে উঠল—না স্যার, এটা করবেন না। আমার অভাব সত্যি, তাই বলে বিশেষ কোন সুবিধা আমি চাই না—আর আমার পাওয়াও উচিৎ নয়। কারণ, আমার থেকে আরও অভাবী ছেলে-মেয়ে আছে—যারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

ভোলানাথবাবু কিছুক্ষণ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—বিনয়, তুমি বয়সে ছোট হলেও তোমার উচিৎ-বোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছি। আমি গত চৌদ্দ বছর যাবৎ এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, কেউ কোনদিন তোমার মতো কথা বলেনি। আর ভবিষ্যতে কারোমুখে শুনব কিনা তা'ও জানিনা। আশীর্বাদ করি, মনের এমন পবিত্রভাব বজায় রেখে জীবনের পথে এগিয়ে যাও।

ভোলানাথবাবুর কথা শুনে তাঁর প্রতি বিনয়ের শ্রদ্ধা আরও গাঢ় হল। সে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এল।

বিকালবেলা বাড়ি ফেরার পথে বিনয় বেশ ভাবনায় পড়ল। কলেজের বাকী ছ'মাসের মাইনে সে কি করে পরিশোধ করবে? টাকার অঙ্ক খুব বেশি না হলেও বিনয় নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কারণ, সে পিসিমার বাড়িতে আশ্রিত। হায়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত পড়াশুনার সকল খরচ তার পিসেমশাই বহন করেছেন। কিন্তু কলেজে ভর্তি হয়ে সে আর পিসেমশাইয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করেনি। সে একটি দু'টি ছাত্র পড়িয়ে নিজের লেখাপড়া ও হাতখরচ চালিয়ে নিচ্ছে। পিসেমশাইএর উপর এখন চাপ দেওয়া চলে না। কারণ তিনি আড়ংঘাটা স্কুলের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী মাত্র। পরিবারের সকলের গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়াও মেয়ে পারুলের লেখাপড়া এবং গান শেখার ব্যয়ভার বহন করতে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন।

বিনয় বেশ মনমরা হয়ে বাড়ি ঢুকছে। তার পিসিমা চপলা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে তোর শরীর ভালো নেই নাকি?

বিনয় মৃদু হেসে জবাব দিল—তুমি খারাপ কিছু দেখছ?

—দেখছি না তো কি? নিশ্চয়ই তোর কিছু হয়েছে। দেখি তোর গা! চপলা বিনয়ের শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন।

বিনয় বলল—তুমি এখনও আমাকে ছেলেমানুষ ভাব? আমি বলছি, আমার কিছু হয়নি, তবু তুমি বিশ্বাস করবে না।

চপলা জবাব দিলেন—তোর মুখচোখ কেমন দেখলুম তাই জিজ্ঞাসা করলুম। ছেলেমেয়ে কখনও মা-পিসির কাছে বড় হয়রে?

বিনয় আর কোন জবাব দিল না। হাতে পায়ে জল দিয়ে ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টাল। তারপর এককাপ চা খেয়ে আধমাইল দূরে শিবনারায়ণপুরে টিউশানিতে গেল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে বিনয় দেখল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পারুল পাশের ঘরে গলা সাধছে। আবহাওয়া দেখে বিনয় হতাশ হল। সে ভেবেছিল আজ সকালবেলায় একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখবে কাছাকাছি আর একটা টিউশানির যোগাড় করা যায় কিনা। রবিবারের সকালটা একেবারে মাটি হয়ে গেল।

বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য বিরাম নিয়ে আবার পুরোদমে নেমে পড়েছে। দুপুরবেলা আহার শেষ করে বহুদিন পরে বিছানায় শুয়ে বিনয় দিবানিদ্রার উদ্যোগ করল। কিন্তু টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দে কানের পর্দা ছেঁড়ার দাখিল। সে তখন কাগজ কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসল। প্রায় ঘন্টাখানেক কাটল। বিনয় কবিতা লেখা শেষ করে পাশে রেখে চুপ করে

শুয়ে আছে। ভেজামাটির সোদা সোদা গন্ধ এসে তার নাকে লাগছে। শালের খুঁটির গায়ে পেরেক ঝোলানো ক্যালেণ্ডারখানা হাওয়া লেগে নড়ছে। তারপাশে মুলিবাঁশের বেড়ায় ঝোলানো বিনয়ের মা করুণার ফটো। যেমন তার রূপ তেমনিই তিনি ছিলেন গুণের অধিকারিণী। গ্রামে এমন লোক ছিল না—যে করুণার সুখ্যাতি না করেছে। সেই করুণা মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে অর্থাৎ বিনয়ের যখন মাত্র দশ বছর বয়স তখন ক্ষয়রোগে মারা যান। প্রতিবেশী বা বাড়ির লোক কেউই বুঝতে পারেনি এই রোগটি চুপিসারে দেহে বাসা বেঁধে এমন পর্যায়ে চলে এসেছিল যা পাড়াগায়ের বাড়ি থেকে দূর শহরের হাসপাতালে নিয়ে ভালোমতো চিকিৎসা করানো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া চিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতিও তখন বিনয়ের বাবার ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা বুদ্ধদেব হঠাৎ উধাও হয়ে যান। কেউ বলে তিনি স্ত্রীর শোকে আত্মহত্যা করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন। কোন্‌টা যে সত্যি বিনয় তা অনেক চেষ্টা করে আজও জানতে পারেনি। বাবা-মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে বিনয় কখনও কখনও আনমনা হয়ে যায়। এ জগৎ-সংসার তার কাছে বিস্বাদ হয়ে ওঠে। তখন পিসিমা সান্ত্বনা দেন এই বলে যে, তার বাবা সুপথে গিয়েছেন—তাঁর জন্য দুঃখ না করে বরং গর্বিত হওয়া উচিৎ। বিনয় মায়ের একটা বাঁধানো ফটো পেয়েছে। কিন্তু বাবার কোন ফটো জোগাড় করতে পারেনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর পাড়ার বন্ধু অসীমের ডাকাডাকিতে বিনয় বিছানায় উঠে বসল। বলল—ভেতরে আয়। এমন ভিজে ভিজে এলি কেন?

অসীম বারান্দায় কোণে ভিজে ছাতাটা রেখে বলল—এমন দিনটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাটি করে দিবি? আয় লুডো খেলা যাক।

—ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি বলিস কি? এ শর্মা দিনে ঘুমিয়ে কখনও সময় নষ্ট করে না।

—'ওহ্ সরি'। আমি ভুলেই গেছলুম যে, শ্রীমান বিনয় কুমার একজন খ্যাতিমান লেখক—তা আজকের টাট্‌কা 'পোডাক্‌শন' কী?

বিনয় মুখে কিছু না বলে তার লেখার খাতাটা এগিয়ে দিল: অসীম খাতার পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল—"হাউ নাইস!" কি "ফ্যান্টাষ্টিক" কবিতা লিখেছিস? তোর পায়ের ধূলো নেওয়া উচিৎ।

বিনয়ের পরিবর্তে জবাব দিল পারুল। সে বলল—দেখ অসীমদা, তুমি অমন ঠাট্টা করোনা। দাদা খ্যাতিমান না হোক, একজন লেখকতো বটে!

অসীম বলল—বারে ঠাট্টা কোথায় করলুম? যা সত্যি তাইতো বলেছি।

—নাঃ তুমি ওভাবে আমার দাদাকে অপমান করবে না।

এবার বিনয় ধমক দিল—তুই থামবি পারু? যা লুডো নিয়ে আয়।

পারুল ভীষণ রেগে গেছে। সে বলল—না, আমি আমার লুডো দেব না, যারা খেলবে তারা দোকান থেকে কিনে আনুক।

বাধ্য হয়ে অসীমকে সন্ধি করতে হয়। সে বলল—আর কক্ষণো তোমার দাদার নামে আমি ঠাট্টা করব না, এই কান মলাছ। যাও লক্ষ্মী বোন, শীগ্‌গির লুডো নিয়ে এসো।

অসীমের কথায় এবার পারুল খুশি হল। ঘর থেকে লুডো এনে তক্তপোষের উপর নামিয়ে রেখে বলল—আমাকেও খেলায় নিতে হবে কিন্তু।

অসীম চট্ করে জবাব দিব—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। না হলে "হেরো" বানাবো আর কাকে?

—ইস্ দেখব কাকে কে "হেরো" বানায়। কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে পারুল লুডোর সরঞ্জাম পেতে খেলায় বসল।

ওরা খেলায় মত্ত। কেউ কম যাচ্ছেনা। মাঝে মাঝে অসীম আর পারুল একে অপরের গুটি কাটছে। বিনয় খেলায় পটু না হলেও ওদের দুজনের লড়াই-এর ফাঁক দিয়ে নিজের কাঁচা গুটি একে একে পাকিয়ে ঘরে তুলছে।

ঘণ্টাখানেক পরে মায়ের ডাকে পারুল কিছুক্ষণের জন্য পাশের ঘরে গেল। যখন ফিরে এল তখন তার হাতে তিনটে বাটি। তাতে আদার কুচি, কাঁচালঙ্কা, পেয়াজ ইত্যাদি দিয়ে ভাজা চিঁড়ে মাখা। খেতে খেতে আবার খেলা জমে উঠল।

সন্ধ্যার আগে তাদের খেলা ভাঙল। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে। অসীমের সঙ্গে বিনয় বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। খানিকটা ইতস্তত করে সে বলল—অসীম আমাকে দুটো উপকার করবি?

অসীম বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দিল—একটা নয়, একসঙ্গে দুটো? ঠিক আছে বল, দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

—কলেজে আমার ছ'মাসের মাইনে বাকী পড়েছে। ভেবেছিলুম "হাফ ফ্রি" হয়ে যাবে, তাই মাইনেটা দিইনি। টিউশানির যা টাকা হাতে এসেছিল কয়েকটা দরকারী বই কিনে খরচ করে ফেলেছি। এখন মাইনের টাকা শোধ করা মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তুই ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়ে কিছু ম্যানেজ করতে পারছিস না?

—না ভাই, আমার দ্বারা সুযোগ নেওয়া সম্ভব হল না।

—তুই দেখছি এখনও মানুষ হলি না।

অসীমের মন্তব্য শুনে বিনয় প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইল।

অসীম আবার বলল—এখন আমাকে কি করতে হবে বল!

আপাততঃ আমাকে শ'খানেক টাকা ধার দিতে হবে, আমি আগামী চার-পাঁচ মাসের মধ্যে টিউশানির টাকা থেকে শোধ করে দেব। আর যদি একটা টিউশানি জোগাড় করে দিস তাহলে খুবই ভালো হয়। তোর টাকাটা তাড়াতাড়ি শোধ করে দিতে পারব।

অসীমের আর্থিক অবস্থা ভালো। পড়া ছেড়ে দিয়ে সে এখন আড়ংঘাটা বাজারে চাল কেনা-বেচা করে। এর আগে বিনয় প্রয়োজনে ছু'একবার তার কাছে টাকা ধার নিয়েছে এবং সুযোগ মতো তা পরিশোধ করেও দিয়েছে।

অসীম বলল—তোর প্রথমটা অর্থাৎ টাকাটা দিতে পারব। কিন্তু টিউশানির কথা এখন কিছু বলতে পারছিনা। একজন অবশ্য মাস্টার খুঁজছেন, তবে তোকে সেখানে পাঠানো যাবে না। কারণ, নিতাইবাবুর বৌ মেয়ে মাস্টার ছাড়া রাখবেন না।

বিনয় আশান্বিত হয়ে বলল—ওঁরা যদি মেয়েকে সাথীদের বাড়ি পাঠান? ওঁদের কাছাকাছিই তো সাথীদের বাড়ি।

—আচ্ছা আমি আজই কথা বলে কাল তোকে জানিয়ে যাব। অসীম বিদায় নিল।

পরদিন সকালে অসীম বিনয়কে টাকা দিতে এসে জানিয়ে গেল—ওঁরা মেয়েকে পড়াতে রাজী হয়েছেন।

বিনয় নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ায় মন দিল।

৪

রাণাঘাট ষ্টেশন। বিনয় বেঞ্চে বসে বানপুর লোকালের জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় তপতী তার কাছে এসে বলল—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাকে ধরতে পেরেছি। রথতলার গেটের কাছে দারুণ জ্যাম হয়েছে, কিছুতেই আসতে পারছিলুম না।

বিনয় প্রশ্ন করল—এতে এমন সৌভাগ্যের কি আছে?

—আছে বৈকি। তপতী ছোট্ট জবাব দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একখানা খাম বের করে বিনয়ের হাতে দিয়ে পুনরায় বলল—পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে আসবেন। চিঠিতে সব লেখা আছে বাড়ি গিয়ে পড়ে নেবেন।

—আপনি আজ কলেজে যান নি?

—না যেতে পারিনি, বাড়িতে কাজ ছিল। পরশু কিন্তু আপনার আশা চাই-ই, নইলে খুব দুঃখ পাব।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বানপুর লোকাল ছাড়ার সময় তপতী হাত নেড়ে বিনয়কে বিদায় জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত বিনয়ের ধৈর্য্য রইল না। সে ট্রেনের কামরার মধ্যে একপাশে সরে গিয়ে অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি এড়িয়ে খাম ছিঁড়ে ভেতরের চিঠিখানা পড়ল। তপতী সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে:—

বুধবার সন্ধ্যায়,
রহিব অপেক্ষায়;
বাতায়নে—
মোর জন্ম দিনে।
যদি আস তুমি,
হব খুশি আমি।

বিনয় বারবার কবিতাটি পড়ল। অবশেষে ভাবতে লাগল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করাটা উচিৎ হবে কি? তা যদি না হয় তবে সে তপতীকে কি উপহার দিতে পারে? সত্যি কথা বলতে কি তার অবস্থা এমন নয় যে, বেশি পয়সা খরচ করে সে দামী কিছু উপহার দিতে পারবে। বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তার পর সে সিদ্ধান্তে এল, আর্থিক মূল্যের কোন জিনিস দেওয়া তার পক্ষে বোকামীর পরিচয়। কারণ, তপতীদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তার ব্যবধান আকাশ-পাতাল। জিনিস দিয়ে মনতুষ্টির চেষ্টা এ ক্ষেত্রে বৃথা। বরং তার চাইতে সরাসরি দীনতা প্রকাশ করা ভালো। সম্ভবতঃ তপতী এমন কাব্য করে চিঠি হয়তো একমাত্র তাকেই দিয়েছে। বিনয় কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসল। তপতীর জন্মদিনে সে কবিতাই উপহার দেবে, তাতে যে যা মনে করে—করুক।

বুধবারদিন কলেজের ছুটির পর বিনয় ঘণ্টা দুই সুব্রতদের বাড়িতে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর তপতীদের বাড়ি পৌছুল। নানারকম আলো দিয়ে বাড়িটাকে এমন করে সাজানো হয়েছে যা একমাত্র বিয়ে বাড়ির সঙ্গেই তুলনা করা চলে। তপতীর স্কুল জীবনের, গানের স্কুলের এবং কলেজের বন্ধু-বান্ধবী ও আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভর্তি। কবিতাসহ অন্যান্য বান্ধবীরা তপতীকে ঘিরে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। তার মধ্যে কলেজের কিছু সুদর্শন ছেলের নামও এসে পড়ছে। ঠিক এই সময় বিনয় সেখানে অতি সাধারণ বেশে উপস্থিত হল। তপতীর সামনে অনেক দামী দামী উপহার দেখে তার মনে হল—এভাবে এখানে না এলেই বোধহয় ভালো হত। সে কোনমতে হাতের জলকাগজে মোড়া কবিতাটি এবং একগুচ্ছ গোলাপ তপতীর হাতে দিয়ে চলে আসছিল। কিন্তু পারল না। তপতী তাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করল। অগত্যা তাকে বসতেই হল।

সে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। মেয়েদের দৃষ্টিঘাত এবং অনুচ্চ মন্তব্য তাকে বিদ্ধ করছে।

কবিতা কৌতূহল দমন করতে না পেরে জলকাগজে মোড়া বস্তুটি খুলতে গেলে তপতী মুখে কিছু না বলে কবিতার কাছ থেকে টেনে নিয়ে সেটা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখে দিল।

এবার বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে তপতীর উদ্দেশ্যে বলল—আমি বাইরে গিয়ে বসছি।

তপতী অবাক হল। বলল—বাইরে কেন? জবাব না পেয়ে সে কবিতাকে বলল—তোরা একটু ব'স আমি আসছি। তারপর তপতী বিনয়কে বলল—চলুন বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সে বিনয়কে নিয়ে ঘরের বাইরে পা দিতেই মেয়েদের মধ্যে হাসির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

ছাদে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে লোকজনদের খাওয়ানো চলছে। মহিমবাবু দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন। মেয়ের ইসারায় সরে এলেন। তপতী বিনয়ের পরিচয় দিতে তিনি বললেন—বাবা, আজ তো ব্যস্ত রয়েছি. নিজের বাড়ি মনে করে মাঝে মাঝে এসো, কেমন ?

—আচ্ছা, সম্ভব হলে নিশ্চয়ই আসব। বিনয় নিচু হয়ে মহিমবাবুকে প্রণাম করে তপতীর সঙ্গে নিচেয় নেমে এল।

এরপর তপতী বিনয়কে সঙ্গে করে নিজের ঘর ও পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। বিনয় অবাক হয়ে দেখল তপতীর পড়ার ঘর যেন মাঝারীগোছের লাইব্রেরী বিশেষ। কাঁচের আলমারী-গুলোতে ঠাসা সব বই।

খাবার টেবিলে বসে বিনয়ের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। কবিতা বা ওই পক্ষীয় কেউই তার পাশে বসছে না। ব্যাপারটা তপতীও দেখল। বিনয়ের খারাপ লাগলেও মেনে নিতে হল।

অবশেষে চলে আসার সময় তপতী কাছে এসে চুপি চুপি বলল—বিনয়বাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি সব দেখেছি এবং সহ্য করে নিয়েছি। কারণ, সকলেই এখানে আমার নিমন্ত্রিত—অন্য কোথাও হলে বিশ্বাস করুন, ওদের বাঁদরামি আমি কিছুতেই মেনে নিতুম না।

বিনয় বলল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কিছুই মনে করিনি। তবে ভবিষ্যতে আমাকে এ ধরণের অনুষ্ঠানে না ডাকলেই খুশি হব—তবে এটা আমার ক্ষোভের জন্য বলছিনা, আপনিই মনঃকষ্ট থেকে রেহাই পাবেন। বিনয় তাকিয়ে দেখল, তপতী কি যেন বলতে চাইছে—কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছেনা। সে আর না দাঁড়িয়ে বলল—তপতীদেবী আপনি উপরে যান, আমি চলি, নইলে ট্রেন 'মিস' করব।

অনুষ্ঠানের সব কাজ আপাততঃ মিটে গেছে। তপতী দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু না, তার চোখে ঘুম নেই। বিনয়ের মুখখানা মনে করতে তার খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে যদি আজও কাছে থাকত তাহলে জিজ্ঞেস করত, সে নিজেকে অত ছোট মনে করে কেন? তার কি নেই? ওর দারিদ্রতা, ওর ক্ষুদ্রতা জাহির করে নিজেকে এমন ঢেকে রাখে কেন?

তপতী বুকের উপর ধরে থাকা কাগজটা নিয়ে উঠে বসল। তারপর লাইট জ্বেলে আবার কবিতাটি পড়তে লাগল:—

তব জীবনের মধুঘন ক্ষণে—
পাঠায়েছ নিমন্ত্রণ—যাই গো কেমনে?
আমি যে দীন অতি, বৈভবে বা চিত্তে;
যদিও জানি তব আহ্বান নহে মিথ্যে।
বাসনা যদি বা জাগে, দেব কি প্রশ্রয়?
বিবেক বলিছে সদা, হেন কার্য্য কভু নয়।

তবু যাব—
ধীর নয়নে ক্ষণিক দাঁড়ায়ে রব,
চাহিব না ও মুখপানে
উঠিবে ঝড় মম অবুঝ পরাণে।
মোর হৃদিকাননের এ কুসুম,
যদি কাড়ে তব নিশার ঘুম ;
প্রভাতে ফেলিও তায়—
যেমনি জঞ্জাল করে বিদায় !

তপতী ফুলদানী থেকে বিনয়ের দেওয়া গোলাপের গুচ্ছটা তুলে নিয়ে এল। তারপর আলো নিভিয়ে ফুলগুলো নিজের দুই চিবুকের উপর ধীরে ধীরে বোলাতে বোলাতে মনে মনে উচ্চারণ করল—না গো না, তুমি ভালবেসে যা দিয়েছ তা কখনও ফেলা যাবে না, আমার হৃদয়ভাণ্ডারে তা সযত্নে তোলা রইল।

৫

আনুমানিক ত্রিশবত্রিশ বছর আগের কথা। সুদর্শন যুবক মহিম মামারবাড়ি বেড়াতে এসেছিল। মামারবাড়ির পাশেই ছিল সঙ্গীত বিশারদ রামতনু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। তাঁর মেয়ে তিলত্তমা। যেমনি নাম তেমনি গুণের পাত্রী। বিধাতা যেন তিল তিল সুষমা দিয়ে তাকে তিলত্তমা রূপে গড়ে তুলেছেন। তার কণ্ঠস্বরের যেন জুড়ি নেই। মহিম দুদিনের জন্য বেড়াতে এসে তিলত্তমার সুরের যাদুতে বাঁধা পড়ল। সে রামতনু মাস্টারের কাছে গান শিখতে যাওয়া শুরু করল। তিলত্তমার সঙ্গে তার গড়ে উঠল প্রথমে পরিচয় এবং পরে প্রণয়। সেই প্রণয় কিছুদিনের মধ্যে এমন পর্যায়ে

পৌঁছুল যাতে পরিণয় ছাড়া পথ নেই। রামতনু যখন সব কথা জানলেন—তখন মেয়েকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অন্য পক্ষে মহিমের বাবা ভৈরববাবুও ছেলের কুকীর্তি শুনে তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলেন।

মহিমের আর বাড়িতে ওঠার কোন পথ রইল না। মামা তারকেশ্বরবাবুর বাড়িতেই সে তিলত্তমাকে নিয়ে বসবাস শুরু করল। সেই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালাতে লাগল। মাসছয়েক বহু চেষ্টার ফলে অবশেষে তারিণী চৌধুরীর কাঠগোলায় খাতা লেখার একটা চাকরি তার ভাগ্যে জুটল।

বছরখানেক পরে তার এক অভাবনীয় সুযোগ এল। মাস দুই আগে তারিণীবাবু মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী গিরিবালা গোলা বিক্রী করবেন বলে ঘোষণা করলেন। মহিম কথাটা মামার কানে তুলল। মামা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। ভগ্নিপতি ভৈরববাবুকে বুঝিয়েসুঝিয়ে এবং গোপনে দিদি উমার গয়না বেচে টাকা এনে মহিমকে কাঠগোলা কিনে দিলেন। গোলার আগের নাম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান নামকরণ হল—"তিলত্তমা কাষ্ঠ বিপণি।"

কয়েকবছর অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ভাগ্যদেবতার অসীম করুণায় গোলার শ্রীবৃদ্ধি হল। যার ফলে পালচৌধুরী পাড়ার এই অংশে বর্তমান বাড়িটি গড়ে উঠল। প্রবল পরিশ্রমের শেষে প্রেয়সী তিলত্তমার রূপ দেখে, তার প্রণয়-সম্ভাষণে এবং সুললিত কণ্ঠের গান শুনে মহিমবাবু তাঁর দিনগুলো বেশ সুখেই কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু বিধাতা কারো কপালেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ লেখে না। নাহলে মাত্র পাঁচটি বছর যেতে না যেতেই বিধাতা কেন রূপোসী স্বর্গদূতী তিলত্তমাকে অসময়ে কেড়ে নেবেন? অন্তঃসত্বা তিলত্তমা রাধারাণী হাসপাতালে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ করেই ইহলোক ত্যাগ করল। মাতৃহারা মেয়ে

তপতীকে মহিমবাবু মামা তারকেশ্বরবাবুর সংসারে রেখে এবং পরে পরিচারিকার সাহায্যে অতি কষ্টে মানুষ করতে লাগলেন। অনেক প্রলোভন এসেছে, বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তিলত্তমার স্মৃতি এবং তপতীর প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট করতে পারে নি।

তিলত্তমার মৃত্যুর পর ভৈরববাবু মহিমকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। কিন্তু তখন আর যাবার প্রশ্ন ওঠে না। মহিমের রাণাঘাটে বসবাস স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন ভৈরববাবুর মৃত্যুসংবাদ এল তখন মহিমকে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি যেতেই হল। বাবার শ্রাদ্ধশান্তি করে বয়োঃকনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু দয়াময়ের উপর সম্পত্তি দেখাশুনার ভার দিয়ে সে রাণাঘাটে ফিরে এসেছিল।

সেই ছোট্ট তপতী আজ একুশ বছরের তরুণী। কয়েকদিন হল মহিমবাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সে জন্য গোলায়ও সবদিন যাচ্ছেন না। গোলার ম্যানেজার হরিপদ ছেলেটি খুবই বিশ্বাসী। সে অন্যান্য কর্মচারীদের সাহায্যে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ। তপতী বাবাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। বড়বাজারের খেয়াঘাটে এসে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে তারা বুড়োশিবের মন্দিরের কাছে বসল কিছুক্ষণ। তারপর হ্যাপী ক্লাবের মাঠের পাশ দিয়ে পালচৌধুরীদের পরিত্যক্ত বাড়ির সামনের ঘাটে এসে তারা ঘাসের উপর বসল। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গৈরিক সূর্য্য পাটে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডানদিকে বড়বাজারের ঘাটে নৌকায় লোক পারাপার হচ্ছে। কোথা থেকে কয়েকখানা কাঠভর্তি বড় নৌকা এসে ঘাটে নোঙর করছে। ওপারে সন্ন্যাসীবাগানের গাছগাছালির মাথায় কুয়াশা নামছে। তপতী এই সময় বলে উঠল—বাবা, এবার বাড়ি চল, নইলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

—আর একটু বসি মা, জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে। এই দেহটা নিয়ে তো চিরদিন ভয়ে ভয়েই কাটালুম—একটু সন্ধ্যার নির্মল বায়ু সেবন করব সে সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছি।

তপতী প্রতিবাদ করে বলল—থাক্ বাবা, তোমার আর অত সাহসে কাজ নেই, এবার ওঠো, বাড়ি চল।

মহিমবাবু ঘাট থেকে উঠলেন। বড় রাস্তায় এসে রিক্সায় উঠে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোদের ফাইন্যাল পরীক্ষার আর দেরি কত মা?

—প্রায় মাস ছয়েক।

—মাস ছয়েক, এত দেরি?

তপতী বাবার কথায় বিস্মিত হল। বলল—এ আর এমন কি দেরি বাবা? এ ক'টা মাস দেখতে দেখতেই কেটে যাবে, আমার তো পড়াশুনাই ঠিকমতো হয়নি। তুমি অত ভাবছ কি বাবা?

—ভাবছি এ ক'টা মাস টিঁকে থাকব তো?

—এসব কি বলছ বাবা? ওসব অলক্ষুণে ভাবনা-চিন্তা তুমি বাদ দাও তো!

—মা, চিন্তা আমি করতে চাইনে। কিন্তু মনে মনে যে সাহস পাইনে। আমাদের বংশে কেউ পঞ্চাশ পেরোয় নি, আমিই একমাত্র চুয়ান্নতেও টিঁকে আছি···মনে হয় আর বেশিদিন যমকে ফাঁকি দিতে পারব না।

কথা শেষ হওয়ার আগেই রিক্সা বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকল। তপতী বলল—বাবা, ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু বল। আজ তুমি আমাকে যুদ্ধের ইতিহাস শোনাবে।

মহিমবাবু রিক্সা থেকে নেমে বললেন—আচ্ছা মা তাই

শোনাব। আজ তোকে সেইসব ভয়ঙ্কর দিনের কথা শোনাব। আরও শোনাব যুদ্ধের ডামাডোলের বাজারে কয়েকটি স্বার্থান্বেষী লোক সাধারণ মানুষের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে রাতারাতি কেমন ফুলে ফেঁপে ধনী হয়ে উঠল—তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল।

তপতী উপর দিকে তাকিয়ে বলল—বাবা, দয়াময় কাকা এসেছেন, উপরে কথা বলছেন।

মহিমবাবু উপরে এসে বললেন—ভাই কখন এলে?

—এই আধঘণ্টা আগে, আপনার শরীর ভালো আছে তো?

—ভালো আর কি ভাই, টিকিট কেটেই রেখেছি, এখন যাত্রার ডাক এলেই যেতে পারি; তোমাদের সংবাদ কী?

—এই চলে যাচ্ছে একরকম। তবে ফসলের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। আমন ধান তো জলের তলায় সব নষ্ট হয়ে গেল, আদায়-পত্র হচ্ছেই না বলা চলে।

—বলো কি হে, শুনেছিলাম যে আমাদের মাঠের কোন ক্ষতি হয়নি?

—দাদা, একবার বেনোজল ঢুকলে কি আর ক্ষতি করতে কারো বাকী রাখে? তবে পলি পড়ায় এবার চোতেলী খন্দটা আশা করা যায় ভালো হবে। পশ্চিমপাড়ার গাঙের ধারের ক'বিঘায় ভালো কলাই গাছ হয়েছে, এখন দেখি কেমন ফল ধরে⋯।

রাত্রে আহারাদির পর মহিমবাবু এবং দয়াময় বসে গল্প করছেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—তোমার ছেলের খবর কি? পড়াশুনা করছে, না রাজা-উজির মারছে?

—না দাদা, সে পড়াশুনাই করছে। খালি সেবার ছাড়া তো আর কোনবার ফেল করেনি। গত বছর বি-এ পাশ করে এখন চাকরির জন্য চেষ্টা করছে।

—তুমি তো তোমার ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

—না না, সে কথা নয়—হৃদয় আমার যেমন ভালো ছেলে—তেমনিই বৈষয়িক বুদ্ধিতেও বেশ পাকা। মামলা-মোকদ্দমার কাজগুলো তো ওই দেখাশুনা করছে। আপনাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য ওঁর চেষ্টার অন্ত নেই। সময় সময় আমিই ওর বুদ্ধির কাছে হেরে যাই।

—আচ্ছা আচ্ছা বেশ ভালো কথা। মহিমবাবু হাসলেন। তারপর আবার বললেন—তোমার ছেলেকে একদিন এখানে পাঠিয়ে দিও। অনেকদিন তাকে দেখি না। আর এবার গিয়ে বাড়িটা একটু মেরামত করে ঠিকঠাক করবে। অনেকদিন ভাই ভিটে ছাড়া। আর কতদিন প্রবাসী জীবন কাটাব? দিন ফুরিয়ে আসছে। যাবার আগে একবার পিতৃপুরুষের ভিটে অর্থাৎ জন্মস্থান দর্শন করে তার ধূলিকণা স্পর্শ করে যেতে চাই ভাই। মহিমবাবু মনে মনে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন ঃ

জননী জন্মভূমিশ্চ··-
স্বর্গাদপি গরিয়সী।

শ্লোক শেষ হলে তিনি ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলেন।

মহিমবাবুর তন্ময়তা ভঙ্গ হলে দয়াময় বললেন—আচ্ছা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ব্যবস্থা করছি। এ নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আর হৃদয়ের কানে কথাটা পৌঁছুলে কোন কিছুরই ত্রুটি থাকবে না। আপনাদের কোন কাজ করার সুযোগ পেলে তার উৎসাহের অন্ত থাকেনা।

মহিমবাবু হেসে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা তাকেই সব ভার দিও। তবে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি সারতে বলো ভাই।

এইসময় তপতী এসে বলল—বাবা, অনেক রাত্রি হল, কাকাবাবুর বিছানা করে দিয়েছি। তুমি কাকাবাবুকে আর কষ্ট দিয়ো না, উনি শুয়ে পড়ুন, তোমার শরীরও ভালো নেই, তুমিও আর রাত্রি জেগো না।

আচ্ছা ভাই দয়াময়, এসো শুয়ে পড়া যাক। না হলে মা শুতে পারছে না। মহিমবাবু দয়াময়কে নিয়ে ঘরে গেলেন।

তপতী দুজনের মশারি গুজে দিয়ে পাশের ঘরে শুতে গেল।

দয়াময়বাবু ফসল বিক্রীর দরুণ যে সামান্য পাঁচশো টাকা দিতে এসেছিলেন তা মহিমবাবু নেননি। উপরন্তু মহিমবাবু বাড়ি মেরামতের জন্য দুই হাজার টাকা দয়াময়কে দিয়েছেন। সেই টাকা নিয়ে দুইদিন থেকে অন্যান্য কতকগুলো দরকারী কাজ মিটিয়ে তিনি গ্রামে ফিরে গেলেন।

কয়েকদিন পর মনস্থির করে একদিন মহিমবাবু কাঠগোলার ম্যানেজারকে বললেন—বাবা হরিপদ, শুনেছ বোধহয় তপুর পরীক্ষার পর আমরা গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। ঠিক করেছি গোলাটা বিক্রী করে যাব।

সেদিন হরিপদ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। পরেরদিন সকাল-বেলা মহিমবাবু গোলায় এলে সে বলল—কাকাবাবু, আমি বলছিলাম কি গোলাটা বিক্রী না করলেই ভালো হয়। হরিপদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহিমবাবু বললেন—বুঝতে পারছি তুমি চাকরি হারাবার ভয় করছ, এই তো? কিন্তু বাবা আমার শরীরের যা অবস্থা—তাতে এসব দায়-দায়িত্ব আর বইতে পারছি না। তা ছাড়া একবার গ্রামের বাড়িতে গেলে সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব হবে কি না বলা যাচ্ছে না। তোমার ভয় নেই, যারা কিনবে তাদেরকে বলে যাব—যাতে তোমার চাকরিটি না যায়।

—কাকাবাবু, একটা কথা বলছিলাম···।

—কী কথা? মহিমবাবু হরিপদর দিকে তাকালেন।

—বলছিলাম কি আমাকে যদি একটা সুযোগ দিতেন ··?

—তোমার বক্তব্য খুলে না বললে বুঝব কি করে?

—ধানতলার মাঠে আমার কিছু জমি আছে, বেচলে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা পাব। এই নিয়ে যদি গোলাটা আমাকে দেন—বাকী টাকা আমি আস্তে আস্তে শোধ করে দেব।

মহিমবাবু একটু চিন্তা করলেন। পঁচিশ বছর আগে মায়ের দেওয়া মাত্র ছয় হাজার টাকা সম্বল করে এই কারবার শুরু করেছিলেন। পরিবারের ভরণ-পোষণ, বাড়ি তৈরি ইত্যাদি ছাড়াও গোলার বর্তমান সম্পদের মূল্য দেড়লাখ টাকার কম নয়। তিনি বললেন—হরিপদ, তুমি যখন বড় মুখ করে বলেছ, তখন তোমাকে নিরাশ করব না। তুমি নিজেই জানো, করাত্ ইত্যাদি বাদে প্রায় ষাট হাজার টাকার শুধু কাঠই মজুত আছে। যাই হোক তোমার সামর্থ্য অনুসারে এখন আমাকে তিরিশ হাজারই দেবে। এরপর বাকী সত্তর হাজার টাকা দশ বছরে শোধ করে দেবে আমি বিশ্বাস রাখি। আমার আর একটা অনুরোধ—"তিলত্তমা কাষ্ঠ বিপণি" এই নামটা তুমি পাল্টাবে না।

মহিমবাবুর মহানুভবতার কাছে হরিপদর মাথা নত হয়ে এল। কারণ, সে জানে মহিমবাবু ইচ্ছা করলে এ গোলা দেড় লাখ টাকার বেশিও বিক্রী করতে পারতেন। তা না করে সর্বসাকুল্যে মাত্র একলাখ টাকায় তিনি গোলা দিয়ে দিচ্ছেন।

দিন তিনেক পরে কোর্টে গিয়ে মহিমবাবু ও হরিপদ চুক্তিপত্রে সই-সাবুদ নিয়ে রেজিষ্ট্রি করে নিলেন যাতে এ নিয়ে ভবিষ্যতে কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

———

৬

পরীক্ষার শেষের দিন। আজ মাত্র একটা পেপার ছিল। কবিতা বা তার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ মেয়েদের আজ পরীক্ষা ছিল না। একটা বাজার ঘণ্টা শুনে তপতী খাতা জমা দিয়ে বাইরে এল। দেখল, বিনয় সুব্রতর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। তপতী ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এখন কি সব দপ্তরী কাজ করা হবে—না বাড়ি যাওয়া হবে ?

সুব্রত বলল—আমি তো বাড়ি যাচ্ছি, বিনয়দা কি করবে জানি না। আপনার পরীক্ষা কেমন হল ?

তপতী জবাব দিল—ওই হয়েছে একরকম, আপনার কেমন হল ?

—আমার তো পরীক্ষা ছিল না। আমি এবার পার্ট ওয়ান দিয়েছি। বিনয়দার ছিল। কি বিনয়দা আপনার পরীক্ষা কেমন হল ?

বিনয় বুঝল, তপতী কায়দা করে কথাটা জিজ্ঞাসা করছে। সে মনে মনে হাসল। তারপর বলল—আমি 'ফেল'।

তপতী তাকে চোখ পাকিয়ে ভৎ সনা করল।

সুব্রত বলল—অমন কথা আপনি মুখেও আনবেন না। সে পুনরায় বলল—চলুন যাওয়া যাক। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি এসেছিলাম এখন বাড়ি যাই।

এস-ডি-ও বাংলো পর্যন্ত ওরা তিনজন একসঙ্গেই এল। ওখানে এসে সুব্রত বলল—বিনয়দা, আমি বাড়ি যাচ্ছি। কাজ আছে, আপনারা এগোন। সে বাঁদিকের রাস্তা ধরে চলে গেল।

রাণাঘাট টকীজের কাছে আসতেই ওদের দৃষ্টিগোচর হল, "শিল্পী" ছবি হচ্ছে। তপতী বিনয়ের চোখে চোখ রেখে বলল—দেখাবেন ?

বিনয় ছোট্ট করে জবাব দিল—দেখাব, সে সাহস কি আমার আছে? বরং হুকুম করলে সঙ্গে থাকতে পারি, টিউশানির পয়সায় হুটো টিকিটও কেটে দিতে পারি ··বিনয় টিকিট কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেল।

তপতী বলল—আপনি নয়, আমি টিকিট কাটব, আপনার কাছে পাওনা থাক্। তপতী বিনয়কে সুযোগ না দিয়ে টাকাটা কাউন্টারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল এবং হুটো টিকিট কিনল।

এরপর ওরা বাপীদার দোকানে জলখাবার খেয়ে সিনেমা 'হলে' ঢুকল। সুচিত্রা উত্তমের বিখ্যাত ছবি "শিল্পী"। হুজন পাশাপাশি বসে আড়ষ্ট হয়ে ছবি দেখছে।

ছবির শেষ দৃশ্য বড়ই করুণ। প্রেমিক ধীমান তার প্রেমিকা রঞ্জনার মূর্তি গড়ার কাজ সমাপ্ত করা মাত্রই তার মৃত্যু হল। নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিল হয়নি। শেষ পরিণতি দেখে বিনয় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এমন সময় তপতীর কাণ্ড দেখে সে একেবারে অবাক্। তপতী তার কাঁধের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অবশ্য তক্ষুণি সে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। তারপর রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সীট্ ছেড়ে উঠল। বাইরে এসে বলল—বিনয়বাবু, মনে কিছু করবেন না; হঠাৎ কি যে হল—আমার কান্না পেয়ে গেল।

বিনয় গম্ভীর হয়ে জবাব দিল—আমি কিছুই মনে করিনি। এ ছবি দেখে অনেক মেয়েই কেঁদেছে, বিশেষতঃ যারা আপনার মতো প্রেমে পড়েছে।

তপতী জিজ্ঞাসা করল—আপনার কি মনে হয় আমি প্রেমে পড়েছি?

—তাইতো মনে হয়। আর তাই বলতে হচ্ছে, আপনার নির্বাচনে বোধ হয় ভুল হয়েছে, আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখা আপনার উচিৎ হয়নি।

—কেন বলুন তো?

—এই ধীমানের কথাই ধরুন না কেন, যদি অবস্থা ওর ভালো হত, একটা ভালো চাকরি বা অন্য কোন উপার্জনের পথ থাকতো—তাহলে ওদের পরিণতি কি এমন বেদনাদায়ক হত? আমি মনে করি, হত না।

—আপনি আর কিছু বলবেন?

বিনয় হেসে ফেলল। বলল—না, আজ আর কিছু বলছিনা। কারণ, আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। পরের ট্রেন আবার তিন ঘন্টা পরে। শুধু বলছি, আপনি বাড়ি গিয়ে সুস্থ মস্তিস্কে আমার কথাগুলো আর একবার ভেবে দেখুন, একটা কিছু করার আগে অনেকবার ভাবা ভালো, কিন্তু করার পরে আর ভেবে কিছু লাভ হয়না। মনে রাখবেন, জীবনটা নিয়ে ছেলে-খেলা করা উচিত নয়, বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা করে পা ফেলতে হয়। এসব কথা বলার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত, তবুও বলতে হচ্ছে—যাতে আপনি প্রতারিত না হন। আচ্ছা আজ চলি।

বিনয় চলে গেলেও তপতী কয়েক মুহূর্ত সেখান থেকে নড়তে পারল না। বারবার কথাগুলো ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো তার মনের অঙ্গনে দুলতে লাগল। তার আঁধার পথ ক্রমশই যেন আলোকিত হয়ে উঠছে, সে পথে এগিয়ে যেতে যেন কোন মানা নেই, ভয় নেই, যেন কোন বাধাও নেই। সে ইচ্ছা-শক্তিতে পরিচালিত হয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে করতে একসময় বাড়ি গিয়ে ঢুকল।

পরেরদিন বিকালবেলা তপতী জানালার ধারে বসে একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। একখণ্ড কালো মেঘ উড়ে এসে সূর্য্যটাকে গ্রাস করে নিল। চারিদিক অন্ধকার নেমে এল। এতক্ষণ পৃথিবীর গাছপালার উপর যে সোনালী আভা খেলা করছিল তার নামমাত্র আর অবশিষ্ট রইল না। মেঘের আড়ালে

বন্দি সূর্য্যের জন্য তপতীর মন হাঁপিয়ে উঠল। সে মনে মনে বারবার বন্দিদশা থেকে সূর্য্যের মুক্তি কামনা করছে। কিন্তু তার ইচ্ছা ফলবতী হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হতে লাগল এ তার জীবনের ক্ষেত্রে কোন ইঙ্গিতবাহী পূর্বাভাস নয়তো? অবশেষে মেঘ সরে যেতে আবার সূর্য্য আত্মপ্রকাশ করলেও তার মনের দুর্যোগ কাটছে না। সে আরও ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়ছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বাবার সঙ্গে তাকে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে হবে। সেখানে না আছে ভালো ডাক্তার. না আছে আধুনিক চিকিৎসার কোন সুযোগ-সুবিধা। আরো যে কত রকম অসুবিধার সম্মুখীন তাকে হতে হবে তা ঈশ্বরই জানেন! কিন্তু তার বাবা মহিমবাবু কিছুই মানতে রাজী নন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে ছেন—"মৃত্যু যখন আসে তখন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তোমার মায়ের কথাই ধরো, হাসপাতালের ডাক্তার কম চেষ্টা করেন নি, কিন্তু বাঁচানো গেল কি? এখানে মরলেও মরব, আর সেখানে মরলেও মরব, মরার আগে বাপ-ঠাকুর্দার ভিটেয় যে ক'দিন পারি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে যেতে চাই।"

তপতী আর কিছু বলতে পারেনি। কারণ, বাবার অবর্তমানে সে যদি সেখানে বাস করতে না চায় তাহলে আবার রাণাঘাট চলে আসতে পারবে। এই জন্য কাঠগোলা বিক্রী করলেও মহিমবাবু বাড়িটি বিক্রী করেন নি। তা ইতিমধ্যেই তপতীর নামে দানপত্র করে দিয়েছেন।

এখান থেকে বিদায় নেবার আগে মহিমবাবু স্থানীয় বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেরে নিচ্ছেন। দরকারী কাজগুলো সমাধা করছেন। হরিপদর কাছ থেকে চুক্তিমতো তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে তপতীর নামে পীপ্‌ল্‌স ব্যাঙ্কে "ফিক্সড্ ডিপোজিট" করে দিয়েছেন। এ ব্যাংকের সুবিধা হল রবিবারেও ব্যাঙ্কে লেনদেন করা যায়।

মহিমবাবুর চিঠি পেয়ে দয়াময়বাবু ছেলে হৃদয়নাথকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে আজই দুপুরবেলা এখানে এসে পৌঁছেছে। খাওয়া দাওয়ার পর হৃদয় বিশ্রাম না নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। তপতীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল কিন্তু তপতী যায়নি। সে ফিরে এসে তপতী যেখানে বসেছিল তার একটু দূরে একখানা টুলে বসে বলল—অমন করে অত কি ভাবছ?

তপতী একটু নড়েচড়ে বসে জবাব দিল—কি আর ভাবব; এমনি চুপ করে বসে আছি, আপনি কোথায় ঘুরে এলেন?

তোমাদের শহরটাই একটু ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিস্তারিণী দেবীর মন্দির দেখে পালচৌধুরীদের বাড়িতে ঢুকেছিলাম, তুমি তো আর দেখালে না কিছু।

হৃদয়নাথ কথাগুলো এমনভাবে বলল যেন তপতী তার কত পরিচিত এবং আব্দারের পাত্রী। হৃদয়নাথ তার একেবারে যে অপরিচিত তা নয়। তপতী যখন ছোট ছিল, ফ্রক পরত—তখন একবার দেশের বাড়িতে গিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়, বালক হৃদয় তখন হাফ প্যাণ্ট পরত। দুইজন ঠাকুর দালানের বারান্দায় দেবদারু ফলের বীচি নিয়ে খেলা করেছিল। পরবর্তীকালে হৃদয়নাথ বড় হয়ে বারকয়েক বাবার সঙ্গে তপতীদের রাণাঘাটের বাড়িতে এসেছে। কিন্তু ধনীর দুলালী আদরের মেয়ে তপতী তাকে তেমন আমল দেয়নি। হৃদয়নাথও এখানে এসে তপতীদের পারিবারিক সম্ভ্রমের গণ্ডী পেরিয়ে তপতীদের সঙ্গে সহজ মেলামেলায় অভ্যস্থ হতে পারেনি। সেই হৃদয়ের বাবা যখন তপতীদের অগাধ সম্পত্তি দেখাশুনার ভার পেলেন এবং ইদানিং মহিমবাবুরা তাদের উপর বেশিরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন—এসবের প্রভাবেই সম্ভবতঃ হৃদয়ের মানসিক জড়তা কেটে গেছে। এসব চিন্তা করে তপতী বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। সে হৃদয়নাথের কথার কোন জবাব না দিয়ে

জ্ঞানদাকে ডেকে বলল—পিসি, হৃদয়বাবু ফিরেছেন, ওঁকে চা জলখাবার দাও।

—এই যে দিচ্ছি। মিনিট পাঁচেক পরে জ্ঞানদা চা এবং জলখাবারের থালা এনে হৃদয়নাথের সামনে টেবিলের উপর রাখল।

হৃদয়নাথ থালা হাতে নিয়ে তপতীর দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার কই?

—আমি খেয়েছি।

—কখন খেলে?

—আপনি যখন ছিলেন না।

হৃদয়নাথ পরটার সঙ্গে ভাজা পটলে কামড় দিয়ে খানিক চিবিয়ে গিলে খেয়ে বলল—তুমি কিন্তু আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে।

হৃদয়ের কথায় তপতী একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দিল—কাল সকালে আমাদের রিক্সাওয়ালা বলাইকে আসতে বলব। ও আমার থেকে অনেক বেশি চেনে, আপনাকে সারাদিন ঘুরিয়ে দেখাবে।

এরপর আর কথা চলে না। হৃদয়নাথ মুখ বুজে খেতে লাগল। তপতী সেখান থেকে উঠে গানের মাস্টার চন্দ্রবাবুকে প্রণাম জানাতে গেল।

দু'দিন পরে তপতীদের যাত্রার সময় ঘনিয়ে এল। হরিপদ ও হৃদয়ের তদারকিতে দু'খানা লরিতে মালপত্র ঠেসে বোঝাই করা হয়েছে। যেগুলো ধরানো গেল না, পরবর্তীকালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে যাওয়া হচ্ছে। মহিমবাবু, তপতী ও জ্ঞানদার জন্য প্রাইভেট কার ভাড়া করা হয়েছে। হৃদয় ও

হরিপদ দুই লরিতে যাচ্ছে। পাড়ার মেয়েরা কেউ কেউ চোখের জল ফেলছেন। কবিতা তপতীকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে। সকলকে প্রবোধ বাক্যে তুষ্ট করে গাড়ি ছাড়তে বেশ বেলা হয়ে গেল।

কয়েকঘণ্টা পরে তারা যখন মাজদিয়া পৌঁছুল তখন মহিমবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিকটবর্তী ডাক্তারের খোঁজ করতে কেউ কেউ কেষ্টগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল। হৃদয়নাথ সেখানেই নিয়ে চলল।

কর্তব্যরত ডাক্তার মহিমবাবুকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে কেবিনে শুইয়ে রাখলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মহিমবাবু কিছুটা সুস্থবোধ করে উঠে বসলেন।

ডাক্তারবাবু মহিমবাবুর শরীরের বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করার মধ্যে একসময় বললেন—আমাকে চিনতে পারছেন ?

মহিমবাবু ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন জবাব দিতে পারলেন না।

এবার ডাক্তার বললেন—আমার নাম রাধাবিনোদ পাল, সুধাবিনোদ মাস্টারের ছেলে আমি।

মহিমবাবুর মনে পড়ল তিনি ছোটবেলায় সুধাবিনোদ মাস্টারের কাছে কিছুদিন প্রাইভেট পড়েছিলেন। নিজের ছেলে রাধু অঙ্কে কাঁচা বলে তিনি প্রায়ই দুঃখ করতেন। তার উপর মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলতেন—দেখ তো মহিম পিটিয়ে-টিটিয়ে গরুটার মাথায় কিছু ঢোকাতে পার কি না। সেই রাধাবিনোদবাবু এখন নামকরা ডাক্তার। ছোটবেলার বিশেষ কোন ত্রুটি দিয়ে জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা বৃথা। অথচ ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মহিমবাবুর লেখাপড়া ম্যাট্রিকের বেশি এগোয়নি।

ডাক্তারবাবু বললেন—আপনার কিছুই হয়নি। বাড়ি গিয়ে দু'একদিন বিশ্রাম নিলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আপনি অসুস্থ, দুর্বল একথা কখনও ভাববেন না। ভাবলেই অসুখ আপনাকে পেয়ে বসবে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইবে। বেশিদিন বাঁচতে হলে উচিৎ—মনের জোরে সব ব্যাধিকে অস্বীকার করা। অবশ্য নিয়মিত ডাক্তারকে দেখিয়ে সময়ে চিকিৎসা বা পরামর্শ নেওয়াও অপরিহার্য। কোন কিছু হয়েছে খবর পেলেই আমি ছুটে যাব, আপনি নির্ভয়ে গিয়ে বসবাস করুন।

তপতী ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবার হাত ধরে গাড়িতে বসাল। রেলব্রিজের পাশ দিয়ে গাড়িগুলো মাথাভাঙায় চর ভেঙে নদী পেরিয়ে এল। শীতকাল থেকে গ্রীষ্মের কয়েকমাস অবধি এখানে এভাবেই গাড়ি বা লরি পার হয়। অন্যসময় হলে মাল নামিয়ে 'ফেরিবোটে' পার হতে হয়।

এভাবে তপতীরা যখন তাদের বাড়ি শিবনিবাসে পৌঁছুল তখন চারিদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মালপত্র নামিয়ে ঘরে তুলতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। গাড়িগুলো আর সেদিন ফিরে যেতে পারল না। পরেরদিন হরিপদ ওই গাড়িতে রাণাঘাট ফিরে গেল।

তপতীর ঘুম ভাঙতে সে শয্যা ত্যাগ করে ঘুরে ঘুরে বাড়িখানা দেখল। গাছে গাছে ডাব, কলাগাছে কলার কাঁদি। গাছের আম এখনও নিঃশেষ হয়নি। বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ছে সারি সারি মন্দিরের চূড়া। একটু দূরে অনেকখানি জমি বেশ নিচু। এমন গ্রীষ্মতেও সবুজ ফসল দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে। তপতী মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইল।

৭

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। বর্ষাকাল হলেও কয়েকদিন হল বৃষ্টি যেন অবসর নিয়েছে। পল্লীর পথঘাট টানা রোদ্দুরে শুকাতে শুরু করেছে। স্নান-আহার সেরে বিনয় ষ্টেশনে গিয়ে বানপুর লোকাল ধরল। কলেজে এসে ভয়ে ভয়ে সে নোটিশ-বোর্ডের দিকে তাকাল। তার হাত পা যেন কাঁপছে। যদিও সে সংবাদ পেয়েছে পরীক্ষায় পাস করেছে তবুও আজকাল কত অঘটনই না ঘটে! এইসময় সুব্রত ছুটে এসে বলল—বিনয়দা আপনি ডিষ্টিংশন পেয়েছেন।

বিনয় অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—সত্যি?

হ্যাঁ, এই দেখুন না।

বিনয় সুব্রতর নির্দেশিত জায়গায় তাকিয়ে দেখল সত্যি তার রোল নম্বরের ডানদিকে ইংরাজী "ডি" অক্ষরটি লেখা রয়েছে। বিনয় যেন স্বস্তি পেল। সুব্রত এবার পার্টওয়ানে পরীক্ষা দিয়েছিল। তার রেজাল্ট আগেই বেরিয়ে গেছে।

এবার বিনয় প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করল।

তিনি আশীর্বাদ করে বললেন—মার্কশীট পেয়েছ তো?

—না স্যার পাইনি। অশ্বিনীবাবু এখনও আসেন নি।

—ওই ওনার দোষ! চিরকাল উনি দেরি করে আসবেন, অবস্থার গুরুত্ব বুঝে বছরের দুটো-চারটে দিন তো আগে আসতে হয়…কিন্তু ওনার ধাতে নেই।

বিনয় ভোলানাথবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে অন্যান্য প্রফেসরদের সঙ্গে দেখা করল। প্রত্যেকেই বিনয়ের ফল শুনে আনন্দিত হলেন। অবশেষে বিনয় দ্বিতীয়বার ক্লার্ক অশ্বিনীবাবুর

খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল, তিনি এসেছেন। বিনয় কিছুক্ষণ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মার্কশীট নিয়ে ইউনিয়নের অফিসে এল। কাগজ-পত্রগুলো সুব্রত ও অজয়কে বুঝিয়ে দিয়ে বলল—ভাই আমার কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে তোমরা তা ঠিক করে নিও। আর আমার ব্যবহারে যদি কেউ মনে কোন দুঃখ পেয়ে থাক, তাহলে আশা করি ক্ষমা করবে।

সুব্রত বলে উঠল—না-না ওভাবে বলবেন না, বরং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে যান, সময় পেলেই এখানে এসে আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন। কোথায় ভর্তি হলেন জানাবেন।

—যদি ভর্তি হই তবে জানাব, তবে মনে হচ্ছে আর আমার লেখাপড়া হবে না, সামর্থ্য নেই ভাই।

অজয় বলে উঠল—না বিনয়দা, এত ভালো ছেলে হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেবেন না, অন্ততঃ মাস্টার ডিগ্রীটা কমপ্লিট করুন।

—দেখি ভাই ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়।

—আমরা আশা রাখি তিনি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করবেনই।

বিনয় অফিস ঘর থেকে বাইরে পা দিতেই কবিতা তার পা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—বিনয়দা সুপ্রভাত।

বিনয় অবাক হয়ে প্রত্যুত্তর করল—সুপ্রভাত।

—আপনার কাছে আমি একটা দরকারে এসেছি।

—বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

—চলুন যেতে যেতে বলছি, আপনি এখন বাড়ি যাচ্ছেন তো?

—হ্যাঁ, চলুন। বিনয় কবিতার পিছু পিছু পথ হাঁটতে থাকে।

কলেজ থেকে খানিকটা দূরে এসে কবিতা বেশ মিষ্টি করে হেসে বলল—আপনাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে, আমার মা আর বৌদি আপনাকে দেখতে চেয়েছে।

বিনয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—হেতু টা কি বলুন তো? আমি কি লাঙুলধারী জন্তুদের মতো তেমন সুদৃশ্য কোন জীব হয়ে উঠেছি?

কবিতা বিনয়ের কথা শুনে জিভ্ কেটে জবাব দিল—ছিঃ ছিঃ আপনাকে আমি ওসব ভাবতে যাব কেন? কবে কি হয়েছে আপনি এখনও মনে রেখেছেন? বিশ্বাস করুন, মনে মনে আমি এখন আপনাকে শ্রদ্ধা করি। তপতীর কথায় একদিন আপনার প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল, বাড়িতে গল্প করেছিলুম। সে কথা শুনে মা এবং বৌদি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু কলেজ বন্ধ থাকায় আপনাকে জানাতে পারিনি।

—ইচ্ছাকৃতভাবে আমি আপনার বান্ধবী তপতীর গায়ে ধাক্কা মেরেছিলুম এই সব কথা তো?

—'ওহ্ মাই গড্।' আমি দেখছি কিছুতেই আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারছেন না। ও ছাড়া কি আপনার ভালো কাজের নমুনা এই কলেজে কেউ কিছু পায়নি? বাবলু দত্তর হাত থেকে রেখা পালকে কি বাঁচান নি? নিজের প্রাপ্য "ফ্রি স্টুডেন্টশিপ" এর সুযোগ কি অন্যজনকে দেননি? কথায় কথায় নানা অজুহাতে ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা কি বন্ধ করেন নি? প্রফেসরদের উপর উশৃঙ্খল ছাত্রদের চোখ রাঙানি কি বন্ধ করেন নি? ছাত্রদের ওষুধপত্র উধাও হয়ে যাওয়া কি ঠেকাননি?

নিঃস্ব রিক্ত হলেও সৎ ও নির্ভীক কাজের জন্য বিনয় কি ছাত্র-ছাত্রী, কি শিক্ষকমণ্ডলী সকলের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। গত সরস্বতী পূজার সময় রাত্রের অনুষ্ঠানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তন্বী সুন্দরী রেখা ভালো নাচ জানে।

ডায়াসে উঠে সে যখন নাচ দেখাচ্ছিল তখন বড়লোকের ছেলে বাবলু হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে সঙ্গে আনা থ্রি-এক্স রামের বোতলের ছিপি খুলে সকলের সামনেই চুমুক দিয়ে শেষ করে ফেলল। তারপর রেখা যখন নাচ শেষ করে স্টেজ থেকে নেমে আসছে তখন তার হাত ধরে জড়িতকণ্ঠে বলল—চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

বেচারা রেখা পড়ল বিষম মুস্কিলে। সে এর আগে বাবলুর প্রকৃতি না জেনে ওর সঙ্গে একটু আধটু মিশেছে, সে জন্য বাবলুর প্রস্তাবে না বলতে পারছে না। অথচ কি বিপদ তাকে গ্রাস করতে আসছে—তা অনুমান করে সে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে।

মেয়েদের কাছে খবর পেয়ে বিনয় সেখানে ছুটে গিয়ে বলল—রেখা, তুমি এখন যাবে না। অনুষ্ঠান শেষ হলে মেয়েদের প্রত্যেককে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায় দেখে বাবলু রেগে বলে উঠল—ও বুঝেছি, তুমি ইউনিয়নের লীডার বলে একাই শালা মজা লুটতে চাও! ···আমার লাভারকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করবে, আর আমি শালা বাদ যাব?

বিনয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে ঠাস্ করে বাবলুর গালে একটা চড় মারল। চড় খেয়ে বাবলু রেখার হাত ছেড়ে দিয়ে ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে গেল। চলল কিছুক্ষণ দুজনে হাতাহাতি। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে পুলিস এসে বাবলুকে ধরে নিয়ে গেল।

কবিতার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে বিনয় মনে মনে আনন্দিত হলেও আবেগ সংযম করে বলল—আমার একার সাধ্য কি? সকলে সহায় ছিল বলেই আমার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন করতে পেরেছিলুম। সে একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—আমি খুবই দুঃখিত যে, আজ আপনার কথা রাখতে পারছি না। কারণ, আমার পিসিমা পথ চেয়ে বসে আছেন কখন আমি পাসের খবরটা নিয়ে যাব এই আশায়। এই ট্রেনটা

ছেড়ে দিলে আবার আড়াইঘণ্টা পরে ট্রেন। তবে যদি এর মাঝে ওদিকে যাই আমি অবশ্যই আপনাদের বাড়িতে যাব, কথা দিচ্ছি। কিন্তু……

—কিন্তু কি? সোজাসুজি বলে ফেলুন। আমি ভীষণ 'ফ্রাঙ্ক' মেয়ে। সম্প্রতি আমার মুখে আপনার প্রশংসা শুনে আমার মা আর বৌদি ভুল করলেও আমি ভুল করিনি। আমি জানি, আপনি আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—তা ছাড়া আপনি বিশ্বাসও করবেন না, আমি আবার ভালোবাসতে পারি, চিরজীবন হয়তো আমি আপনার চক্ষুশূল হয়েই থাকব।

কবিতা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল—ভয় নেই আমি আপনাকে জ্বালাব না, আমার পথ আমি ঠিক করে রেখেছি। বড়জোর আপনাকে নিকট আত্মীয় মনে করে সাক্ষী হিসাবে কোর্টে যেতে বলব। ইচ্ছা হলে যাবেন, না হলে যাবেন না।

কবিতার কথা শুনে বিনয় একেবারে 'থ' হয়ে গেছে। সত্যিই কবিতা যদি সরাসরি বলত, "আমি তোমাকে ভালবাসি" একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করত না। বিনয় বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে আন্তরিক সম্বোধন করে বলল—লক্ষ্মী বোন, তুমি সত্যিই আমাকে বাঁচিয়েছ। না হলে যদি তোমাকে ভুল বুঝে প্রত্যাখান করতুম তাহলে তোমার ভালোবাসাকে অমর্যাদা করা হত। আর যদি তোমার কথা বিশ্বাস করে ভালোবাসার টানে বা তোমার দেহের আকর্ষণে তোমার দাবী স্বীকার করে নিতুম তাহলেও দুঃখের অন্ত ছিল না। কারণ, নারীপুরুষের ভালোবাসার সুস্থ পরিণতি হল—বিয়ে করে ঘর বাঁধা। আর তা করতে গেলেই প্রয়োজন স্থায়ী কোন উপার্জনের পথ। কিন্তু আমার না আছে কোন বিষয়-আশয়, না সম্ভাবনা আছে কোন চাকরির। কারণ, এই চাহিদা পূরণের সব ভাণ্ডারই আজ আমাদের দেশে বাড়ন্ত। তাই পদে পদে তোমাকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া আমার

আর কিছু করার থাকত না। তা ছাড়া .....

—আমি জানি বিনয়দা, একজন আপনাকে ভালোবাসে এবং সে আমার প্রিয় বান্ধবী তপতী। তার কোন ক্ষতি হোক সে আমার জীবন থাকতে আমি চাইব না। আর সেই জন্যই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। নইলে এই পাজি মেয়েটার কাছ থেকে সহজে নিস্কৃতি পেতেন না—জেনে রাখুন, দারিদ্রতার ভয়ে এ মেয়ে কিছুতেই আপনাকে হারাতে রাজী ছিল না। কবিতা মুখ নিচু করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলল—আজ সারা কলেজ তাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন, কিন্তু দেখা পাননি; এই তো? ও কলেজে আসেনি। ওরা এখানে নেই, ওদের গ্রামের বাড়ি চলে গেছে। যদি ঠিকানা চান—দিতেপারি। আপনার ঠিকানাটা ও চেয়েছে।

বিনয় চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল— না কবিতা, ওর ঠিকানা এখন নিচ্ছি না; আর আমার ঠিকানাও ওকে দিচ্ছি না। তবে যদি কোনদিন ওর উপযুক্ত হতে পারি তবে কষ্ট করে খুঁজে নেব।

বিনয়ের জবাব শুনে কবিতা বিস্মিত হল। সে জিজ্ঞাসা করল—ঠিকানা না জানলে যোগাযোগ করবেন কি করে?

বিনয় দূরের দিকে তাকিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বলল—যদি সত্যি হয়—আমাদের মন, আমাদের ভালোবাসাই পরস্পরকে একদিন খুঁজে নেবে। তা ছাড়া মিলনের সেতু স্বরূপ তুমি তো আছই!

ওরা কথা বলতে বলতে ষ্টেশনে এসে ঢুকেছিল। এখন গাড়ি ছাড়ার হুইসেল দিতেই বিনয় বলল—কবিতা আবার কথা হবে, আজ চলি কেমন? সে গাড়ির কামরায় গিয়ে উঠল।

যতক্ষণ গাড়ি না ছাড়ল—ততক্ষণ কবিতা প্লাটফরম ছেড়ে যেতে পারল না। অবশেষে বিনয়কে বিদায় জানিয়ে সে বাড়ির পথে পা দিল।

৮

কয়েকদিন হল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নামছে। দিন-রাত্রি বিরাম বিহীন। পথ-ঘাটে লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই হয়। দোকান বাজার করা দায় হয়ে পড়েছে। এই দুর্যোগের দিনেই মহিমবাবুর হাঁপানি বেড়ে উঠল, সেই সঙ্গে জ্বর। কয়েকদিন হল দয়াময় বা হৃদয় এদিকে আসছে না। কোনরকমে রাত্রি ভোর হতেই জ্ঞানদা ছাতা নিয়ে ছুটল। প্রথমে রাধাবিনোদ ডাক্তারকে খবর দিয়ে দয়াময়বাবুর বাড়ি গিয়ে সব কথা জানাল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই আগে ডাক্তার এবং পরে দয়াময়বাবু এসে পৌছুলেন। সেদিন দুপুরের পরে বৃষ্টি ছেড়ে গেল। কিন্তু মহিমবাবুর হাঁপানির টান কমছে না। ইতিমধ্যে হৃদয় তার মা ভাগ্যবালাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌছেছে। ডাক্তারবাবু ওষুধ পাল্টে দিচ্ছেন। অবশেষে সন্ধ্যার মুখে রুগীর জ্বর ও হাঁপানির টান কমলে রাধাবিনোদবাবু তপতীকে সাহস দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরেরদিন হাসপাতালের কাজ সেরে রাধাবিনোধবাবু মহিমবাবুকে দেখতে এলেন। মহিমবাবুকে বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে। হাঁপানির টান নেই বললেই চলে। তপতী নিশ্চিন্ত মনে বাবার পাশে বসে রয়েছে। হঠাৎ মহিমবাবু ডান হাতখানা বাড়িয়ে তপতীর মাথার মধ্যে বুলিয়ে বলে উঠলেন—মা গো, আর তোরা আমায় মায়ার বাঁধনে বেঁধে রাখিসনে, এবার আমায় যেতে হবে। তবে যাবার আগে তোকে নিশ্চিন্ত করে যেতে পারছিনা এই যা দুঃখ—আমি যা ভেবেছিলুম তা হবার নয়, তুই তা করিস না। মহিমবাবুর দু'চোখে জলের ধারা।

যে তপতী একটু আগে নিশ্চিন্ত ছিল এখন বাবার কথা শুনে সে কেঁদে তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

মহিমবাবু মেয়েকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—কাঁদিসনে মা, এখানে এলেই একদিন ফিরে যেতে হয় রে !

রোরুদ্যমানা তপতী বলে উঠল—তোমার কি সময় হয়েছে যে, যাবে যাবে করছ ? তোমাকে যেতে দেব না, সমস্ত সম্পত্তি বেঁচে আমি তোমার চিকিৎসা করাব।

মহিমবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—ওরে পাগলী চিকিৎসা করাবি কাকে ? এখানে প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় নিয়ে আসে, সময় পূর্ণ হলে কেউ কি থাকে রে ?

এইসময় ডাক্তারবাবু সিরিঞ্জ বের করে মহিমবাবুকে ইঞ্জেক্‌শন দিতে উদ্যত হলে মহিমবাবু ভারী গলায় বললেন—ভাই আর এসব কেন ? আপনি তো সবই বুঝছেন।

রাধাবিনোদবাবু বললেন—কি করি বলুন. এ তো আমাদের কর্তব্য, যতক্ষণ দেহে প্রাণের লক্ষণ থাকে—ততক্ষণ আমাদের চেষ্টা করতেই হবে যে ! এটা লঙ্ঘন করি কেমন করে বলুন ?

মহিমবাবু আর বাক্য ব্যয় না করে ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরলেন। ডাক্তারবাবু পরম যত্নে ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে নিজেই ভালো করে হাতটা ম্যাসেজ করে দিলেন।

এবার মহিমবাবু বালিশের তলা থেকে একখানা লেখা কাগজ বের করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিলেন। ডাক্তারবাবু পড়ে দেখলেন লেখা রয়েছে—"আমার অবর্তমানে সকলপ্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমার মেয়ে তপতী। জ্ঞানদাবালা বিশ্বাস যদি তপতীর সংসারে স্থান না পায় তাহলে তপতীর কাছ থেকে সর্বনিম্ন প্রতিমাসে দুইশত টাকা হারে আজীবন ভাতা পাবে।"

কাগজখানা চেয়ে নিয়ে মহিমবাবু সই করে সাক্ষীদের সই করানোর জন্য ডাক্তারের কাছে দিলেন। ডাক্তারবাবু প্রথমে সই করে জ্ঞানদাকে দিয়ে সই করালেন। তারপর দয়াময়বাবুর হাতে দিলেন।

দয়াময়বাবু উইলখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তারপর মহিমবাবুকে বললেন—দাদা আমার হৃদয়ের কথা কিছু লিখলেন না তো ?

মহিমবাবু বালিশের তলা থেকে একটা খাম টেনে বের করে দয়াময়ের হাতে দিয়ে বললেন—এটা গুনে নাও, তোমার ছেলেকে দিলাম, এর বেশি কিছু আর করতে পারলুম না ভাই !

দয়াময় খাম থেকে বের করে গুনে দেখলেন কুড়িখানা একশ টাকার নোট অর্থাৎ দু'হাজার টাকা আছে। তিনি খামটা হৃদয়ের দিকে এগিয়ে দিলেও সেটা হাতে না নিয়ে সে গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

দয়াময় আবার বললেন—দাদা দয়া করে হৃদয় আর তপতীর বিয়ের ব্যাপারে যদি কিছু বলে যান······

মহিমবাবু এ কথার কোন জবাব দিলেন না। তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এই সময় হৃদয়নাথ অসহিষ্ণু হয়ে বাইরে চলে গেল। মহিমবাবু এরপর কি যে বললেন বোঝা গেল না। কারণ, তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। ইতিমধ্যে মহিমবাবুর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তপতী ও জ্ঞানদা তাঁর নিষ্পন্দ শরীর জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রাধাবিনোদবাবু অবাক হয়ে গেছেন। তাঁর ডাক্তারী জীবনে হামেশাই মৃত্যু দেখছেন। কিন্তু এমন বলে-কয়ে মৃত্যু এই প্রথম দেখলেন। তিনি আর কিছুক্ষণ বসে তপতীকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং "ডেথ সার্টিফিকেট" লিখে রেখে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। হৃদয় ও দয়াময়বাবু শব যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নদীতীরে শ্মশানঘাটের কিছুদূরে একটি বড় আকন্দ গাছের পাশে তপতী দুই হাঁটুর উপর চিবুক রেখে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। জ্বলন্ত চিতা থেকে ধুয়া উঠে উর্ধাকাশে যেখানে মিলিয়ে যাচ্ছে সেখানে তার দৃষ্টি। বারবার তার মনে প্রশ্ন জাগছে, মানুষ

মরে কোথায় যায়? তার বাবার আত্মা আজ কোন্ লোকে চলে গেল? তপতীর চোখের অশ্রু শুকিয়ে এখন দুটো লম্বমান দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। সে যখন এইসব কথা ভাবছে তখন জ্ঞানদা তার গায়ে হাত রেখে বলল—ওরা তোমাকে ডাকছে শুনতে পাচ্ছ না?

তপতীর সম্বিত ফিরে এল। সে আস্তে আস্তে চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শবদাহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছয়-সাত হাত আন্দাজ একখানা কাঁচা বাঁশের গোড়ার দিকে মহিমবাবুর দেহাবশেষ অর্থাৎ অদাহ্য নাভিমূল ওই বাঁশে গেঁথে কোমর জলে নেমে বাঁশখানাকে তিন চারজন ধরে পুঁতে রাখল। যিনি দাহকর্ম তদারকি করছিলেন তাঁর নির্দ্দেশমতো তপতী মাটির কলসীতে জল ভরল। তারপর চিতার আগুন নিভিয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে সকলের সঙ্গে শ্মশানঘাট ত্যাগ করল।

সকলের সঙ্গে স্নান সেরে তপতী যখন বাড়ি এল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গোটা বাড়িটা যেন সারা বিশ্বের উদাসীনতা নিয়ে শোক প্রকাশ করছে। এটা যেন দু'দিনের আগের দেখা পৃথিবী নয়। এত ছোটবেলায় তার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল সে তখন কিছুই জানতে পারেনি। আজ পিতৃহারা হয়ে তার মনে হল এতদিনে সে মা এবং বাবা উভয়কেই হারাল। বাবার ঘরে এসে বালিশের উপর মাথা রেখে সে মূর্ছা গেল। খানিকবাদে জ্ঞান ফিরে দেখল, সে হৃদয়ের মায়ের কোলে শুয়ে আছে। জ্ঞানদা পাখা দিয়ে বাতাস করছে। হৃদয় চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। দয়াময়বাবু বলে উঠলেন—মা, অত বিচলিত হয়ো না। তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। মনে রেখ, তুমি আমারও মেয়ে। ছোটবেলা থেকে আমি তোমার বাবার প্রিয়বন্ধু। তিনি যে ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন তার দায়িত্ব আমি যথা নিয়মে পালন করবই। তুমি নির্ভয়ে পিতৃব্যজ্ঞানে আমার উপর নির্ভর কর। অতঃপর দয়াময়

স্ত্রীকে বললেন—আজ থেকে তুমি ওর মা,..মনে রেখ তোমার কণিকা আর তপতীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

স্বামীর কথার উত্তরে ভাগ্যবালা বললেন—আজ কেন, কবে থেকেই আমি জানি—যেদিন মা তপতী প্রথম এখানে পা দেয় সেদিন থেকেই ও আমার মেয়ে। তিনি নিজের ডান হাতখানা তপতীর একরাশ ভেজা চুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

এঁদের মিষ্টি কথা বা প্রবোধ বাক্যে তপতী যথার্থ সান্ত্বনা খুঁজে পেল কিনা ঠিক বোঝা গেলনা। কারণ, তার কান্নার গতিবেগ ক্রমশই বাড়তে লাগল। ভাগ্যবালার কোলের মধ্যে তার কোমল দেহলতিকা কান্নার গতিবেগের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

৭

বিনয় প্রথমে ভেবেছিল আর পড়াশুনা না করে সে এখন থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। কিন্তু পিসেমশাইএর নির্দ্দেশমতো সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিদ্যালয় থেকে ভর্তির আবেদন পত্র নিয়ে এল। সেগুলো যথাযথভাবে পূর্ণ করে জমা দিয়ে এসে কিছুদিন চুপ করে বসে ছিল। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সে ডাক পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তৎপর হল। অবনীবাবু ধার-দেনা করে তাকে ভর্তি করে দিয়ে কিছু বই-পত্র কিনে দিলেন।

বিনয় প্রতিদিন আড়ংঘাটা থেকে কলকাতা যাতায়াত করে। কিন্তু এই যাতায়াত তার পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক। কারণ, রাণাঘাট

থেকে অনেক ট্রেন থাকলেও আড়ংঘাটা থেকে সাতটার পরে সেই পৌণে দশটায় ট্রেন। সাতটার ট্রেন ধরতে গেলে তার ঠিকমতো স্নান-খাওয়া হয় না। আর পরের ট্রেনে গেলে ক্লাস শুরু হওয়ার অনেক পরে পৌঁছুতে হয়। মরার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ল যখন রেল কোম্পানী ব্যাপক হারে মাসিক ও দৈনিক টিকিটের মূল্য বাড়িয়ে দিল। আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে খরচের মাত্রা বজায় রাখতে সে প্রতিদিন শিয়ালদা থেকে কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া-আসা করছে। তবে এতে যা বাঁচে তার থেকে টিকিটের দাম বেড়েছে বেশি। আগেরমতো সে এখন আর টিউশানি করতে পারছে না। কারণ, খুব সকালে বেরিয়ে ক্লাস করে বাড়ি ফিরতে প্রতিদিন তার রাত হয়ে যায়। নিজের পড়াশুনা করতেই সময়ে কুলায় না। তা ছাড়া ছুটির দিনগুলোতে পিসিমার মেয়ে পারুলকে নিয়ে বসতে হয়।

বিনয়ের সমস্যার সমাধান হয় যদি সে কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে কোথাও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। অনেকে থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে গৃহশিক্ষক চান। কলকাতায় ভর্তি হবার আগে বিনয় এমন কয়েকবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছে। সে আশায় আশায় এখন মাঝে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় চোখ বুলায়। যাতায়াতের পথে দেওয়ালে কিংবা লাইটপোষ্টে আটকানো বিজ্ঞাপনগুলোয় চোখ বুলায়। কিন্তু সে যা খোঁজে তা পায় না।

দিলীপ রায় বলে একটি ছেলের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ হয়েছে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। সে কলকাতা পুলিস্ বিভাগে চাকরি করে। চাকরির সঙ্গে এম-এ পড়ছে। মাঝে মাঝে ডিউটির জন্য ক্লাসে আসতে পারে না। যেদিন ক্লাসে আসে না তার পরের দিন সে বিনয়ের কাছ থেকে পড়া জেনে নেয়।

দিলীপ যখন জানল বিনয় আড়ংঘাটা থেকে এসে প্রতিদিন

ক্লাস করছে তখন সে অবাক হয়ে গেল। বলল—অতদূর থেকে রোজ রোজ আস কি করে? তোমার কষ্ট হয় না?

—কি করব ভাই উপায় তো নেই।

দিলীপ একটু চিন্তা করল তারপর বলল—তুমি এক কাজ করতে পার—আমাদের ব্যারাকে থাকতে পার। যারা নাইট ডিউটিতে যায় তাদের বেড খালি পড়ে থাকে। তা ছাড়া যাদের বাসা আছে তারাও ডিউটির পরে কেউ ব্যারাকে থাকে না। তুমি পর্যায়ক্রমে আমার এবং আমার বন্ধুদের বেডে কাটিয়ে দিতে পার।

বিনয় বলল—আমি তো সেখানের এমপ্লয়ী নই, আমাকে থাকতে দেবে কি?

দিলীপ জবাব দিল—সে আমার দায়িত্ব। আমার 'গেষ্ট' হিসাবে তোমাকে কিছুদিন রাখার পর ভেবে দেখব কি করা যায়।

দিলীপের পরামর্শমতো সেদিন বাড়ি ফিরে বিনয় পিসে-মশাইকে সব কথা জানাল।

অবনীবাবু সব শুনে বললেন—তোর যদি এতে পড়াশুনার উপকার হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে গিয়ে থাকবি। আমি এখান থেকে যা পারি পাঠিয়ে দেব। আর বাসাভাড়া বাবদ যখন কিছু লাগছে না তখন এ সুযোগ না ছাড়াই ভালো।

বিনয় কথাটা আবার বুঝিয়ে বলল—যদি দিলীপের অফিসের তরফ থেকে আপত্তি ওঠে তবে আমাকে ব্যারাক ছেড়ে চলে আসতে হবে ....

—বেশ তাই আসিস।

পরেরদিন সকালে পিসিমার চামড়ার স্যুট্‌কেসে প্রয়োজনীয় জামা কাপড় ও বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিনয় কলকাতা রওনা হচ্ছে। যাবার সময় পিসিমা বারবার বললেন—দেখ বিনয়, মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে খবর পাঠাস কেমন থাকিস। আর

ওখানে গিয়ে যেন ইউনিয়ন-টিয়ন করিসনে বাবা, দিনকাল ভালো নয় রে! শীতের সময় তোর সেই বন্ধু দিলীপকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিস, খেজুরে রস-গুড় খেয়ে যাবে।

বিনয় পিসিমাকে প্রণাম করে স্যুট্কেস হাতে নিয়ে হেসে জবাব দিল—আচ্ছা আচ্ছা।

এই সময় পারুল সরে এসে বিনয়ের পায়ের কাছে ঢিপ করে প্রণাম করে বলল—দাদা, আমার পরীক্ষার আগে এসো কিন্তু, না হলে আমি নির্ঘাত ফেল করব।

—আচ্ছা আসব। তুই পরীক্ষার আগে আমাকে চিঠি লিখে জানাস। আর তোর কিছু আট্কালে সুশীলদার কাছে জেনে নিস, আমি তাঁকে বলে গেছি।

বিনয় শিয়ালদা নেমে গেট দিয়ে বেরুবার মুখে আশ্চর্য্য হয়ে দেখল দিলীপ দাঁড়িয়ে আছে। সে এতখানি আশা করেনি। দিলীপকে সে কিছুই বলে যায়নি। গতকাল দিলীপের প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু তার আসার সম্ভাব্য ট্রেনের কথা জানিয়েছিল। দিলীপ সে কথা মনে রেখে শিয়ালদা এসে দাঁড়িয়ে থাকবে বিনয় তা ভাবতেই পারেনি।

দিলীপ ভেবেছিল বিনয়ের সঙ্গে অনেক মালপত্র থাকবে। তেমন কিছু না দেখতে পেয়ে বিনয়ের হাত থেকে স্যুটকেসটাই জোর করে কেড়ে নিয়ে সে হাঁটা ধরল। অগত্যা বিনয় শুধু ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে করে দিলীপকে অনুসরণ করল।

তিনের-এ বাস ধরে বডিগার্ড লাইন্স ষ্টপেজে নেমে তারা কলকাতা পুলিসের সশস্ত্র আরক্ষা বাহিনীর গেট দিয়ে ঢুকল। গেটে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র পুলিস কর্মী ভেতরে প্রবেশকারীদের প্রত্যেকের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। বিনয় দিলীপের সঙ্গে যাচ্ছে বলে তাকে কেই কিছু জিজ্ঞসাবাদ করল না। কিন্তু এদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পাহারা দেওয়া দেখে বিনয়ের গা সির্ সির্ করছে।

অবশেষে বিনয় একটা বিল্ডিংএর চারতলার বড় ঘরে এল। ঘরে সারি সারি লোহার খাটিয়া পাতা। তারই একটায় দিলীপের বিছানা গোটানো রয়েছে। দিলীপ হাতের স্যুটকেস নামিয়ে রেখে বিনয়কে বসতে বলল। মিনিট দশেক পরে দিলীপ তাকে খাবার ঘর—অর্থাৎ মেসে নিয়ে গেল। মেসের ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। রবিবার বলে আজ তাদের ক্লাস নেই। দিলীপ বিনয়কে সব কিছু দেখিয়ে চিনিয়ে দিল।

বিনয় দিলীপের 'গেষ্ট' হিসাবে মেসে খায়। দিলীপের থেকে একটু চার্জ বেশি লাগলেও বাইরের হোটেলের চার্জএর চেয়ে অনেক কম। তা ছাড়া পেট ভরে খাবার পাওয়া যায়। বিনয় পিসেমশাইএর কাছ থেকে যে টাকা পায় তাতে খুব কষ্টে তাকে চালাতে হয়। তার অবস্থা বুঝে দিলীপের অন্যান্য সহকর্মী পরিতোষ, অনিল, মণি এরা এক একদিন রাত্রে মেসে গিয়ে না খেয়ে রুটি তরকারী ব্যারাকে এনে খায়। এতে এদের বাড়তি রুটিতে বিনয়ের খাওয়া হয়ে যায় তাকে সেদিনের মিল চার্জ দিতে হয় না।

দিলীপ সব রকম চেষ্টা করল। কিন্তু বিনয়কে ব্যারাকে রাখার কোন লিখিত অনুমতি পেল না। তবে কোম্পনী কমাণ্ডার হাবিলদাররা কেউ তাকে চলে যেতে বাধা করেনি।

ইতিমধ্যে রত্নেশ্বরবাবু নামে একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ হয়েছে। রত্নেশ্বরবাবুর কোয়ার্টার এই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই। তিনি দিলীপের কাছে বিনয়ের কথা শুনে বলেছেন—যদি নিতান্তই ব্যারাকে থাকা না যায়, তাহলে তিনি বিনয়কে তার কোয়ার্টারে থাকতে দেবেন। বিনয় কলকাতায় থাকার ব্যাপারে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশুনায় ভালোভাবে মন দিল।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে বছর দুই আগে সেই জায়গাটা ওদের কাছ থেকে দখল মুক্ত করেছেন এটা কি তাঁর পক্ষে অন্যায় কাজ হয়েছে বলে মনে কর ?

সহদেব মণ্ডল বাধা দিয়ে বলল—শোনেন মা ঠাকরুন, আমি বুড়ো মানুষ, যা বলব সত্যি কথাই বলব। জায়গাটা আপনাদের ঠিক কথা, তয় জবরদখল ঠিক কথা নয়। আমি পূর্ববাংলার লোক হলিও চল্লিশ বচ্ছর যাবৎ অখানে বাস করতিছি। আপনার ঠাকুরদার আমল থিকেই অখানে পুজো হয়ে আসতিছে। আপনার ঠাকুদ্দা মারা যাবার পর কয়বছর পুজো বন্ধ ছিল। তারপর এই হীরালালরা ওদেশ থেকে এখানে এসে আবার পুজো চালু কবিছে। পুজোর থানের চারপাশে পড়ে থাকা জমিটুক উরা সম্বচ্ছর ইডা-উডা চাষ ক'রে আমার কাছে জমা রাখত। পুজোর সুমায় সেই ফসল বেঁচে পুজোর কাজে লাগানো হত। কিন্তুক গত দুই বছর তা আর হতি পারতিছে না। এই বাবুর বাবা সব বন্ধ করে দেছে। আপনি মা আসল মালিক, আপনি যা বলবেন আমরা শুনে চলে যাব। আর জোর করে বাস করা নিয়ে এখোন কিছু বলতিছিনে। আমার বাবার আমল থেকে জাগা-জমি কিনে বসবাস করতিছি। এগের মধ্যি অনেকেই খুব গরীব, বাড়িঘর করার ক্ষ্যামতা নেই; গাঙে মাছ ধবে কোনরকমে বাঁচে আছে। কুঁড়ে ঘর বানায়ে বাস করতিছে। আজকাল গাঙে আর তেমন মাছ পাওয়া যায় না। মাঝেমাঝেই দর্শনার মিলির পঁচাজল ছাড়ায় মাছ সব মরে নষ্ট হয়ে যায়। ইরা খুবই কষ্টে টিঁকে আছে। তুমার বাবা ওগের তুলে দিওয়ার জন্যি মামলা জুড়িছেন। সে যাইহোক আজ আমরা সে ব্যাপারে আসিনেই। আজ যে জন্যি আইছি আপনি কিছু আশ্বাস বাকিা বলেন।

তপতী ভালো করে সবকিছু শুনে নিয়ে চিন্তা করে

বলল—আচ্ছা আপনারা আগের মতোই পূজা করবেন। আর পূজার কয়েকদিন আগে এসে আমার কাছ থেকে প্রতিমার দামটা নিয়ে যাবেন।

সকলে চা-জলখাবার খেয়ে তপতীর প্রশংসা করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।

ওরা বাড়ির বাইরে পা দিতেই হৃদয় তপতীর দিকে তাকিয়ে রাগতস্বরে বলল—সব তলিয়ে না বুঝে এমন নির্দ্দেশ দেওয়া কি তোমার ঠিক হল?

তপতী বিষয়টি লঘু করার জন্য হেসে জবাব দিল—ঠিকই বুঝেছি হৃদয়দা, সামান্য জিনিস নিয়ে এতগুলো লোকের শত্রু হয়ে কি কাজ বলুন!

একে তুমি সামান্য বলছ? এমন হলে তো তোমাদের বিষয়-আশয় সব উচ্ছন্নে যাবে? তা ছাড়া বাবা যেখানে ভালো বুঝে নিষেধ করেছেন সেখানে তোমার হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিৎ হল না।

তপতী বলল—উচিৎ হল না ঠিকই—কিন্তু আমি জানি কাকাবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন। অন্যায় কিছু করে থাকলে উনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করবেন।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হৃদয়নাথ জবাব দিল—বাবা তোমাকে স্নেহ করেন বলেই তুমি তাঁকে এমন অপমান করার সাহস পেলে। জেনে রাখো বাবা বা আমি আগ্‌লে না রাখলে তোমাদের এসব সম্পত্তির কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। ঠিক আছে আমি বাবাকে বলব, এবার থেকে আমাদের আর করণীয় কিছু নেই, তুমিই সবকিছু দেখেশুনে রাখবে। হৃদয়নাথ তার জলখাবার না খেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তা দেখে তপতী ডেকে বলল—হৃদয়দা, আপনি ও ভাবে

রাগ করে না খেয়ে চলে যাবেন না ; আমি ভীষণ কষ্ট পাব।

হৃদয় তপতীর কথার কোন জবাব না দিয়ে দ্রুত পায়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

এই সময় জ্ঞানদা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল—অত সাধাসাধি কিসের ? যার শিল যার নোড়া ওরা তারই ভাঙছে দাঁতের গোড়া। তুমি প্রশ্রয় দিয়েই তো বাপ-ব্যাটাকে অমন মাথায় তুলেছ, ওরা গোপনে গোপনে তোমাদের কত সর্বনাশ করেছে তার কোন খবর রাখো ?

—কি করব পিসি, আমার মাথার উপর তো কেউ নেই। তাছাড়া বাবা যে ওদের উপরেই আমার দেখাশুনার ভার দিয়ে গেছেন !

—ভার দিয়ে গেছেন বলে কি ওরা যা খুশি তাই করবে ? আর ওদের হাতের পুতুল হয়ে তুমি ধনে-প্রাণে মরবে ? আমি বলছি, একটু শক্ত হও ; বুঝিয়ে দাও—তুমি মেয়ে হলেও এ বাড়িতে তোমার পূর্ণ অধিকার। তুমি ওই সব পরগাছা হটাও নইলে তুমিও মারা পড়বে আর আমারও ইজ্জত যাবে। বুড়োর মতলব আমি টের পেয়েছি। বুড়ো যে করেই হোক তোমাকে ছেলের বউ করে তোমার সমস্ত সম্পত্তি লুটে নেবে। তারপরই তোমাকে যমের বাড়ি পাঠাবে। বুড়ো লুকিয়ে লুকিয়ে আমার শরীর দেখে, আমার রূপের সুখ্যাতি করে। আমাকে কি বলে জানো ? বলে—"তোর টাকা-পয়সা বা জিনিস-পত্তর যখন যা দরকার আমাকে বলিস।"

এসব কথা শুনে তপতী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার জবাব দেওয়ার ভাষা হারিয়ে গেছে। রাগে দুঃখে তার হার্টফেল করার দশা। সে ছলছল চোখে ঘরে গিয়ে বাবা ও মায়ের ফটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এই আশায় যেন ওঁরা অদৃশ্যলোক থেকে তাকে অভয়দান করেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর দয়াময়বাবু এ বাড়িতে এলে তপতী নিজেকে শান্ত ও সংযত করে বলল—এই রাত্রে আবার কষ্ট করে এলেন কেন ?

দয়াময়বাবু জবাবে বললেন—কষ্ট আর এমন কি মা ? আর সবদিন আসিও না, কর্তব্যের খাতিরেই আমাকে তা করতে হবে, এতে আমি আনন্দ পাই। তোমার বাবা আমার কাছে এই ভরসাই পেয়ে গেছেন।

—সে কর্তব্য তো অনেকদিনই করছেন কাকাবাবু, আপনি যখন থাকবেন না তখন তো আমাদের এমনিভাবেই থাকতে হবে।

—তখন যা হয় হবে, কিন্তু যতদিন আমি আছি···

—কাকাবাবু আমি বলছিলুম কি আপনি দিনের বেলায় সুযোগ সুবিধা বুঝে আসবেন। রাত্রিবেলা এভাবে আপনাকে কষ্ট দেওয়ায় আমিও কষ্ট পাই।

—বেশ মা তাই হবে। না হয় তোমার কাকীমাই মাঝে মধ্যে এখানে রাত কাটিয়ে যাবে।

—কাকাবাবু আমার তারও প্রয়োজন হবে না। আমি শহরে মানুষ, ভূত-টুত বড় একটা বিশ্বাস করি না।

—মা ভূতই কি সব ? মেয়েমানুষের অনেকরকম বিপদ আসতে পারে।

—ভাগ্যে থাকলে ঘটবে বৈকি। আমি মনে করি বিপদে রক্ষাকারী একমাত্র ভগবান—মানুষ নয়। ভালো কথা কাকাবাবু আজ সকালে আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। পুবপাড়ার ওদেরকে কালী পূজা করতে সম্মতি না দিয়ে পারলুম না। আমি জানি আপনি কথাটা শুনে মনে মনে রাগ করেছেন ··

—না, রাগ করার আর কি আছে ? তোমাদের জিনিস, যা ভাল মনে করেছ, করেছ। আমি বরং এতে খুশিই হয়েছি।

কথাটা যে তিনি কিভাবে বললেন তা বুঝতে তপতীর কষ্ট হল না। সে বলল—চলুন কাকাবাবু খেয়ে আসি, পিসির রান্না হয়ে গেছে।

—না মা, আমার খিদে নেই, তুমি যাও।

দয়াময়বাবুর জবাব শুনে তপতী মনে মনে হাসল। তারপর বলল—কাকাবাবু তাহলে বোঝা গেল আপনি সত্যি সত্যিই রাগ করেছেন।

অগত্যা দয়াময়বাবুকে উঠতেই হল। অন্যদিনের মতো রাত্রের আহার এ বাড়িতেই সারলেন এবং তাঁরজন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সেদিন রাত্রে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তপতীর পাশের ঘরে জ্ঞানদা শোয়। মাঝরাতে তার চিৎকার শুনে তপতীর ঘুম ভেঙে গেল। সে বেরিয়ে গিয়ে জ্ঞানদার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে পিসি? অমন করছ কেন?

—দেখনা কোন্ হারামজাদা বারবার আমার দরজায় টোকা দিচ্ছে।

—কি বলছ তুমি? তপতীর চোখে অবিশ্বাস।

জ্ঞানদা জোর দিয়ে বলল—আমি সত্যি বলছি, একবার দু'বার নয়, বারবার।

তপতী আলমারী থেকে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ নিয়ে বাড়ির উপর নিচে ফোকাস ফেলে দেখল, কোথাও কিছু নেই। ইতিমধ্যে ননী জেগে উঠেছে। সে কিছু বলতে পারে না। তপতী অনেক ডাকাডাকির পর দয়াময়বাবুর ঘুম ভাঙাল। তিনি অবাক্ হয়ে বললেন—তাইতো, চোরেদের বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে তো! কাল থানায় গিয়ে বড়বাবুকে জানিয়ে আসতে হবে দেখছি!

দয়াময়বাবুর কথা শুনে জ্ঞানদা জবাব দিল—চোর না আরো কিছু, এ ভদ্দরলোকের পোষাক পরা শয়তানের কাজ। সে তপতীকে ডেকে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে হাঁটা দিল। যাবার আগে দয়াময়বাবুকে শুনিয়ে গেল—ঠিক আছে আমি ভালো করে পাকড়াও করে সকলকে দেখাব কেমন চোর ধরা পড়েছে।

পরেরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তপতী শুনল, দয়াময়বাবু খুব ভোরে উঠে বাড়ি চলে গেছেন। জ্ঞানদা একচোট্ হেসে নিয়ে বলল—ওর লজ্জা থাকলে আর এ বাড়িতে রাত কাটাতে আসবে না।

তপতী চোখ রগ্ড়ে বলল—পিসি তুমি কি যে বলছ আমার মাথায় একদম ঢুকছে না।

—তা ঢুকবে কি করে? তুমিতো এসব বোঝ না। আর তোমার বোঝার মতো কোন দুর্ঘটনা যেন ভগবান না ঘটান—তাঁর কাছে এই আমার সর্বক্ষণের প্রার্থনা। কথাটা শেষ করে জ্ঞানদা রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

১১

কালী পূজার দিন সকাল বেলা তপতী তানপুরা নিয়ে কয়েকখানা গান করে নিচের ঘরে এসে দেখল, সহদেব মণ্ডল বসে আছে। সে হাত জোড় করে বলল—মা আপনি পুজোর কাছে যাবেন বলেছিলেন তাই নিতি আসলাম। আপনার পুজোর জোগাড় দিতি হবে।

তপতীর মনে পড়ল গত সপ্তাহে প্রতিমার দরুণ টাকা দেওয়ার সময় সে পূজার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

তপতী এখন বলল—আপনি একটু চা খাবেন তো ?

—না মা, আমি উপোস আছি।

—উপোস থাকলেও কেউ কেউ চা তো খেয়ে থাকেন···

—আমার মা নির্জ্জলা উপোস :

—ওহ্ আচ্ছা। আপনি তাহলে এগোন আমি একটু পরে ননীকে সঙ্গে করে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে স্নান সেরে গরদের শাড়ী পরে আধমাইলের উপর পথ হেঁটে তপতী পুব পাড়ায় পৌঁছাল। এখানে অধিকাংশই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। চূর্ণীর তীরে বেলগাছ, নিমগাছ, পাকুড় গাছে ছায়াচ্ছন্ন একটি জায়গা ঘিরে পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। পাকুড় গাছের গোড়ায় ইঁট ও মাটি দিয়ে গাঁথা পূজা বেদী। অনেকখানি পরিষ্কার জায়গা সকালেই গোবর-জলে বেশ পরিপাটি করে লেপা হয়েছে। দেবীর আসন ও তার সম্মুখে নদীর পলিমাটি দিয়ে লেপা। তপতীর প্রথম দায়িত্ব হল, আতপ চালের গোলা দিয়ে বেদীর উপর ও সামনে আল্পনা দেওয়া। ইতিমধ্যে একটা মেয়ে চাল বেটে রেখেছে। তপতী প্রতি বছর সরস্বতী পূজার সময় বাড়িতে নিজের হাতে আল্পনা দিত। সুতরাং এ কাজে সে বেশ রপ্ত। তা ছাড়া তপতী একসময় ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তাই এখন আল্পনা দিয়ে সকলের প্রশংসা কুড়াল। একটু পরে চণ্ডি পাঠ হবে। চণ্ডি পাঠের আগে পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মশাইএর নির্দেশ মতো তপতী বিধিমতে পূজার জোগাড়ে মন দিল।

ইতিমধ্যে তপতীকে দেখার জন্য এ পাড়ার মেয়ে-পুরুষে ভিড় করেছে। নিজের হাতে পূজার কাজ করতে পেরে তপতীর খুব ভালো লাগছে। মনটা ভক্তিতে ভরে উঠছে। এখানে শহরের মত মাইকের কোন উপদ্রব নেই। তপতীর সব থেকে বেশি আনন্দের বিষয়—তাদের জমিতে মায়ের আবাহন হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মশাইএর শুদ্ধ উচ্চারণে মা চণ্ডির বন্দনায় তপতীর মন গভীর প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

বিকাল বেলায় ঢাকের বাজনা সহকারে প্রতিমা আনা হল। এর মধ্যে তপতী একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে। ইতিমধ্যে এখানে প্রচার হয়ে গেছে তপতী গান জানে।

জয়দেব এসে হাত জোড় করে বলল—দিদিমণি, এরা সব আপনার গান শুনতে চাচ্ছে। যদি অনুমতি করেন তো আমরা হারমণিয়াম, ডুগি-তবলার জোগাড় করে আনি।

পুরুত মশাই কথাটা শুনে বলে উঠলেন—বেশ ভালো কথা, মাত্র সন্ধ্যা ছ'টা বাজে, পূজায় বসতে এখনও তিন ঘণ্টার বেশি বাকী। মা যদি জানো তো তু'চার খানা কালীকীর্ত্তন কর।

তপতী লজ্জানম্রভাবে উত্তর দিল—যা জানি তা না জানারই সামিল, পাঁচজনকে শোনাবার মতো তেমন কিছু নয়।

—তাতেই হবে মা। এখানে ভুল ধরার মতো তেমন পণ্ডিত ব্যক্তি কেউ নেই। তুমি গাইলে ওরা আনন্দ পাবে, দেখনা ওরা কেমন ভিড় করে এসেছে। যাও হীরালাল, হারমণিয়াম নিয়ে এসো।

পুরুত মশাইএর কথা কানে যেতে যা দেরি—সঙ্গে সঙ্গে চারজন ঘোষপাড়ার দিকে ছুটল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হারমণিয়াম, ডুগি-তবলা ইত্যাদি নিয়ে এল।

তপতী মনে মনে মা কালীকে স্মরণ করে গান ধরল:

জাগো জাগো মহাদেবী,
ত্রিনয়নী কালিকা।
জাগো মা মহেশ্বরী,
ত্রিজগত পালিকা॥
ঘোর তমসা নাশে,
জেগে ওঠ মা মনহরষে;
তব আগমন আশে—
সাজায়ে রেখেছি হৃদি বেদিকা॥

জাগাও মা সন্তানে,
ঘুচাও অবোধ অজ্ঞানে ;
জ্বালায়ে দাও মা অন্তরে
জ্ঞান-ভকতি বর্তিকা ॥

তপতী প্রথম গান শেষ করে দ্বিতীয় গান ধরল :

মা গো কালী করালি বদনা,
লয়ে তোর চরণ স্মরণ,
করি তোরে আরাধনা ॥
লোকে বলে ভয়ঙ্করী,
তুই নাকি মা শঙ্করী ;
তোর অভয়া রূপ দেখা মোরে
ও গো মা ত্রিলোচনা ॥

গান শেষ হতেই পুরোহিত বললেন—বাঃ বাঃ বেশ চমৎকার গলা তো তোমার। মা আরো দু'এক খানা হোক! অন্যান্য শ্রোতারাও আবার গান করার জন্য সমস্বরে অনুরোধ জানাল। অগত্যা তপতীকে আবার গান ধরতে হল। সে গাইল :—

(মন) কালী বলায় দ্বিধা কিসে।
যে নাম হরে ভব যাতনা বিষে ॥
বদন ভরে বললে কালী,
ঘুচবে তোমার মনের কালি ;
আঁধার ঘরে জ্বলবে বাতি
অপরূপার ভাব-আবেশে ॥
(মন) জেনেছে যে ওই মহিমা,
বিষয় ফাঁদে সে আর পড়ে না ;
কালী বলে কাল কাটায়ে—
অন্তিমে যায় ব্রহ্মময়ী পাশে ॥

এরপর অনুরোধে তপতী একের পর এক গান গেয়ে চলল। অবশেষে রাত্রি আটটা বাজলে গান বন্ধ করে সে পূজার জোগাড়ে তৎপর হল।

মণ্ডপের বাইরে আর একটা ঘেরা জায়গায় মস্ত কড়াইয়ে ড়ি রাঁধতে বসেছে সহদেব মণ্ডল নিজে।

রাত্রি সাড়ে ন টায় দেবীর আবাহন মন্ত্রে ধূপ-ধুনোর গন্ধে পবিত্র পরিবেশ গড়ে উঠল। তপতী বেদীর একপাশে বসে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এগিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে শঙ্খধ্বনি করছে।

রাত্রি আড়াইটের সময় পূজা শেষ হল। এখন প্রসাদ বিতরণের পালা। ঢাক বেজেই চলেছে। মণ্ডপের সামনে অনেকখানি জায়গায় কলাপাতা বিছিয়ে এ পাড়ার কয়েক'শ ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা ভোগ খেতে বসেছে। তপতী কাপড় আটো-সাটো করে নিয়ে মায়ের খিচুড়ি ভোগ পরিবেশনে লেগে গেল। মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে—"কালী মায় কি জয়, রক্ষাকালী কি জয়।" উচ্চারিত ধ্বনি তপতীর মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছে তাকে আনন্দসলিলে অবগাহন করাচ্ছে। পূজার মধ্যে যে এমন অনাবিল আনন্দ আছে তপতী এর আগে কোনদিন উপলব্ধি করেনি।

ভোরবেলা বাড়ি গিয়ে স্নান করে এবং ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে তপতী আবার পূজামণ্ডপে ফিরে এসেছে। দধিকর্মা অন্তে পাড়ার মেয়েরা মা কালীকে বরণ করে জল-মিষ্টি মুখে দিচ্ছে। অতঃপর প্রতিমাকে নৌকায় উঠিয়ে মাঝনদীতে নিয়ে যাওয়া হল। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে শ্রীশ ঢাক নেচে নেচে বিসর্জনের বাজনা বাজাচ্ছে। তার ছোটছেলে নীরোদ কাঁসিতে তাল দিচ্ছে। অনেকের সঙ্গে তপতীও ঘাটের পাড়ে নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখছে। নৌকা সাতপাক ঘুরে সোজা হতেই "কালীমায় কি জয়, রক্ষা কালী কি জয়" বলে

কয়েকজন প্রতিমা নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর প্রতিমা ডুবিয়ে সাঁতার কেটে একে একে ঘাটে উঠে এল। তপতীর চোখ জলে ভরে উঠেছে। বাড়ি ফেরার সময় সে ভাবছে—আশ্চর্য এমন একটা পবিত্র উৎসবকে দয়াময় কাকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এখানে যারা ঝুপরি বেঁধে বাস করছে তাদের দুর্দ্দশা তপতীর মনে দাগ কাটল। যারা এমনি করে বাস করছে তারা চিরদিন এমন ছিল না। পূর্ববঙ্গে প্রত্যেকেরই পুরুষানুক্রমে যেমনই হোক নিজস্ব জমি, বাড়ী-ঘর, সুস্থ-জীবিকা ছিল। ভাগ্যের বিড়ম্বনা হলেও দুইদেশের পূর্ববর্তী একশ্রেণীর অপরিণামদর্শী কূটনৈতিক নেতাদের হটকারীতায় তারা এক দেশ থেকে বিতাড়িত এবং আর এক দেশে অবাঞ্ছিত। তপতী মনে মনে ঠিক করল, আদালতের মামলা তুলে নিয়ে এইসব জায়গায় এদের অধিকার সে নিজে মুখে ঘোষণা করে যাবে।

১২

বিনয় মাঝে মাঝে ব্যারাকের খাটিয়ায় শোয়। আবার মাঝে মাঝে রত্নেশ্বরবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে থাকে। দিনের অন্যান্য সময় খাওয়া-দাওয়া তার ব্যারাকেই হয়। এখানে আর একটি ছেলে ভৈরবের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। ভৈরব রিজার্ভ অফিসে একাউন্টস্ ক্লার্ক-এর কাজ করে। সন্ধ্যার পরে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে যায়। পুঁথিগত বিদ্যার বাস্তবায়নে সে ব্যারাকের অনেককে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে।

কয়েকমাস আগের কথা। একদিন সকালবেলা বিনয় উপলব্ধি করল, তার জ্বর এসেছে। বিছানায় উঠে বসার সামর্থ্য নেই। খবর পেয়ে ভৈরব এসে তাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিল। সেদিন বিকালের মধ্যেই তার জ্বর ছেড়ে গেল। সে অনেকবার চেষ্টা করলেও ভৈরব ওষুধের দাম নিল না। সেই থেকে ভৈরবের সঙ্গে বিনয়ের ভাব। সময় পেলেই বিনয় ভৈরবের বেডে গিয়ে বসে। অনুমতি পেয়ে ডাক্তারী বইগুলো নাড়াচাড়া করে।

একদিন ভৈরব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আপনি ডাক্তারী পড়বেন? আমাদের কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়েছে। আপনার যা পড়াশুনা সহজেই চান্স পেয়ে যাবেন।

বিনয় একটু চিন্তা করে জবাব দিল—পড়তে তো ইচ্ছা হয় কিন্তু খরচ চালানো যে মুস্কিল।

আপনি যদি পড়েন তাহলে আমি ছুটো-একটা টিউশানি যোগাড় করে দিতে পারি। আমি সামনের মাস থেকে আমার টিউশানিটা ছেড়ে দেব ভাবছি। কোনরকমে যদি একটা বছর চালিয়ে নিতে পারেন তাহলে পরের বছর থেকে খরচ চালানোর মতো পয়সা আপনি রুগী দেখেই জোগাড় করে নিতে পারবেন। খানিকটা আয়ত্ত হলে দেখবেন অনেকেই চিকিৎসার জন্য আসবে। আপনি পয়সা না নিতে চাইলেও কেউ কেউ যেচে দিয়ে যাবে। প্রথম বছরেই ভর্তি, বই কেনা ইত্যাদি বাবদ বেশ কিছু থোক্ টাকার দরকার। তবে যত দিন এখানে থাকেন আমার বই নিয়ে আপনি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন।

ভৈরবের উপদেশ বিনয়ের মনে ধরল। সে বলল—তাহলে আমাকে একটা 'ফর্ম' এনে দিন। চেষ্টা করে দেখি কিছু টাকার ব্যবস্থা হয় কিনা।

ভৈরব সেদিন রাত্রেই 'ফর্ম' ও 'প্রস্পেক্টাস' এনে দিল। বিনয় যথাযথ পূরণ করে ছ'দিন পরে গিয়ে নিজে 'ফর্মটা' জমা দিয়ে এল।

মাস দু'য়েক পরের কথা। বিনয় 'এ্যাড্‌মিসন টেষ্ট' দিয়ে এসে কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সেদিন রাত্রে যখন বেডে বসে পড়াশুনা করছে তখন ভৈরব 'মেডিক্যাল কলেজ' থেকে ফিরে এসে জানাল—বিনয়বাবু, সুখবর আছে। আপনি টেষ্টে এলাউ হয়েছেন। নোটিশ বোর্ডে আপনার নাম দেখে এলাম। আমি জানতাম—আপনি চান্স পাবেনই।

বিনয় খবরটায় যেমন আনন্দ পেল তেমনি দুশ্চিন্তায়ও পড়ে গেল। ভর্তির টাকাটা তার কিভাবে জোগাড় হবে? পরেরদিনই সে আড়ংঘাটা যাত্রা করল। উদ্দেশ্য যেমন করে হোক শ'চারেক টাকার জোগাড়। তার দুটোমাত্র সম্বল আছে। একটা হল তার বাবার আমলের একটা এংলো সুইচ ঘড়ি। সেটা কখনও চলে, কখনও চলে না। সে মাঝেমধ্যে সারিয়ে সজীব রাখার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়টা হল ছোটবেলায় তার মায়ের দেওয়া একটা ছোট সোনার আংটি। এমন ঘড়ি কেনার খরিদ্দার সম্ভবতঃ জুটবে না। কিন্তু আংটিটা কেউ শ'দেড়েক-দু'য়ে কিনতেও পারে—বিনয়ের আশা আছে।

পিসিমা সব শুনে বিনয়কে বললেন—তোর মায়ের ওটুকু স্মৃতিকে আর নষ্ট হতে দিচ্ছি না, অন্য কি করা যায় আমি দেখছি। তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন—হ্যাঁগো বুধুটা তো দুধ ছাড়ান দিয়েছে, দেখনা ওকে বিক্রী করা যায় কিনা?

বুধু অর্থাৎ বাড়ির গরুর এঁড়ে বাছুর—যার জন্ম হয়েছিল বুধবারে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে বকনা বাছুরেরই চাহিদা থাকে—যাতে ভবিষ্যতে দুধ ও বাচ্চা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এসব বাড়িতে এঁড়ে বাছুর একটু বড় হলেই বিক্রী করে দেওয়া হয়।

অবনীবাবু বললেন—বিক্রী না হবার কি আছে? সেদিন ওপাড়ার তারক মণ্ডল কিনতে এলে তুমিই তো তখন বেচতে দিলে না। আজ উপযাচক হয়ে গেলে দাম কম বলবে—তার চেয়ে বরং আজ বীরনগরের হাটে নিয়ে যাই…

এই কথা শুনে বিনয়ের পিসী রেগে বললেন—না, তোমাকে আর হাটে গিয়ে ব্যাপারীদের হাতে বেচে কাজ নেই—কার হাতে বলতে কার হাতে গিয়ে বেঘোরে ওর প্রাণটা যাক্ ও আমি চাই না। দু'দশ টাকা কম হলেও তারক মণ্ডলকেই দিয়ে এস, ইচ্ছা হলে গিয়ে দু'চোখে দেখেও আসতে পারব—ওর জন্মের সময় কম কষ্টটা করেছি!

অবনীবাবু তখনই তারক মণ্ডলের বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন।

তারকের নিজের একটা এই বয়সের এঁড়ে বাছুর আছে। ছোট থেকে একটু একটু করে চাষের কাজে তালিম দেওয়ার জন্য তার একটা জোড়ের বলদবাছুর দরকার। সে অবনীবাবুকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করল—এসময় কি মনে করে?

অবনীবাবু কোন ভূমিকা না করে সরাসরি বললেন—বিনয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী পড়তে ভর্তি হবে। টাকার দরকার। তুমি বাছুরটা দাম করে এসেছিলে, যদি নাও তাহলে টাকা দাও। তবে তুমি পঞ্চাশটা টাকা বেশি দিতে পারলে ভালো হয়, আমি মাইনে পেয়ে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা ফেরৎ দিয়ে যাব।

তারক আর দ্বিরুক্তি করল না। ঘরে গিয়ে সাড়ে তিনশ' টাকা এনে গুনে অবনীবাবুর হাতে দিয়ে বলল—একটু বসে চা খেয়ে যাবেন তো?

—না তারক, তোমাকে আর আতিথেয়তা করতে হবে না—আমার সময় নেই, বাড়ি ফিরেই স্কুলে যেতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার, বাছুরটা আমাদের বাড়িতেই থাক, কাল সকালে গিয়ে নিয়ে এস, কেমন ?

—আচ্ছা তাই হবে।

অবনীবাবু টাকাটা গুনে নিয়ে পকেটে পুরে বাড়ির দিকে চললেন।

বিনয় টাকা নিয়ে দুপুরের ট্রেনেই কলকাতা রওনা হল। পরেরদিনই তাকে ভর্তি হতে হবে। এখনও তাকে আর কিছু টাকার জোগাড় করতে হবে। অবশ্য সিরাজুল ভরসা দিয়েছে যেটা কম পড়বে সে দিয়ে দেবে। বিনয় ভরসা পেয়েছে বন্ধু দিলীপের কাছেও।

ডাক্তারীতে ভর্তি হবার দিন কুড়ি বাদে একদিন সকাল বেলা হাত-মুখ ধুয়ে এসে বিনয় আর দিলীপ বেডে বসে চা খাচ্ছে এমন সময় ভৈরব এসে বলল—বিনয়বাবু, চলুন আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবেন। আমার ছাত্রের বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, পয়লা তারিখ থেকে আপনাকে পড়াতে হবে। আমি সব বলে রেখেছি।

বেশি দূরে নয়। 'বডিগার্ড লাইন্স' থেকে সাত আট মিনিট হেঁটে তারা মনসাতলা লেনে প্রদীপদের বাড়িতে এল। প্রদীপের বাবা শঙ্করবাবু পোর্ট কমিশন অফিসে কাজ করেন। তিনি স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। বিনয় ভৈরবের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকে নমস্কার জানাতে শঙ্করবাবু প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললেন—আমার তো বাবা আর কথা বলার সময় নেই, আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বেরুতেই হবে। মাস্টার মশাই তো আর পড়াবেন না, আপনি নিজের মনে করে ওদের পড়াশুনার দায়িত্ব নেবেন এই আমার অনুরোধ।

বিনয়ের পরিবর্তে ভৈরব হেসে জবাব দিল—কাকাবাবু, আপনি কিছু ভাববেন না। যে মাস্টার পাচ্ছেন এর তুলনা

হয় না, আমার থেকে অনেক ভালো মাস্টার। একার অঙ্কে এম-এস-সি দিয়েছে।

—ভালো হলেই ভালো বাবা। কথাটা বলেই শঙ্করবাবু বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

প্রদীপের মা মলিনাদেবী কিন্তু 'আপনি' না বলে সরাসরি বিনয়কে লক্ষ্য করে বললেন—বাবা তোমার তাড়া না থাকলে ওদের পড়ার ঘরে গিয়ে একটু ব'স, আমি তোমার মেসোমশাইএর ভাতটা বেড়ে দিয়েই আসছি।

বিনয় পড়ার ঘরে এসে দেখল খাটের উপর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পড়ছে। ভৈরব স্বভাব সুলভ হাসি হেসে বলল—এই আমার ছাত্র প্রদীপ আর ওর দিদি কল্পনা। পুনরায় সে বলল—কল্পনা, বিনযবাবু তোমাদের নতুন মাস্টার মশাই। সামনের মাস থেকে ইনিই পডাবেন।

কল্পনা আর প্রদীপ উঠে এসে প্রথমে বিনযকে ও পরে ভৈরবকে প্রণাম করল।

বিনয় চেয়ারে বসে দুই ভাই-বোনের কি কি সাবজেক্ট জেনে নিয়ে ওদের বইপত্র নেড়েচেড়ে দেখছে এমন সময় মলিনা দেবী ঘরে এলেন। তাঁর হাতে দুটো থালায় কিছু জলখাবার। তিনি মেয়েকে বললেন—যা তো ওঘর থেকে জলের গেলাস দুটো নিয়ে আয়।

মলিনাদেবী দু'জনকে জলযোগ করতে দিয়ে ভৈরবের উদ্দেশ্যে বললেন—বাবা তুমি মাঝে মাঝে আসবে তো?

ভৈরব খেতে খেতে জবাব দিল—আসব বৈকি, সময় পেলেই ঘুরে যাব।

—কি জানি বাবা তুমি আর সময় পাবে কি না। তোমার বন্ধুকে বলে দিও—আমার ছেলেমেয়েরা কিসে কিসে কাঁচা।

ভৈরব জলের গেলাস নামিয়ে রেখে জবাব দিল—ওকে কিছুই বলতে হবে না মাসীমা, ও পড়ানোর সময় সব বের করে

নেবে। তবে মাসীমা আমাকে যা দিতেন তার থেকে ওকে কিছু বাড়িয়ে দিলে ভালো হয়, ওর নিজের পড়াশুনার ব্যাপারে বেশ টানাটানিতে চলছে।

—সে বাবা আমি এখনই কিছু বলব না, যদি ভালোভাবে পড়াতে পারে তাহলে ওর বিষয়ে নিশ্চয়ই বিবেচনা করব।

সেদিন বিনয় আর ভৈরব দু'জনই ঘণ্টা দুই যৌথভাবে পড়িয়ে ব্যারাকে ফিরে এল এবং পরের মাসের প্রথম দিন থেকে সকালের দিকে বিনয় পড়াতে যেতে লাগল।

১৩

আজকাল তপতীর একটি নতুন সহচরী জুটেছে, কুণ্ডু বাড়ির মেয়ে অপর্ণা। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে আর তার লেখাপড়া এগোয় নি। বর্তমানে সে তপতীর কাছে সেলাই শেখে। তপতী অপর্ণাকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। ওর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, গল্পে অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়। রাণাঘাটের কবিতার কথা স্মরণ করে সে বলে—ছাখ্ তোর এই অপর্ণা নামটা আমার একদম মনে থাকে না। তার চেয়ে বরং আমি তোকে কবিতা বলে ডাকব—জানিস সে আমার কত আপন ছিল…

অপর্ণা কৃত্রিম রাগ করে উত্তর দেয়—কবিতা ছাড়া তো আর কেউ তোমাকে আপন করে নিতে পারে না—তবে মনে রাখবে কি করে?

—ঠিক বলেছিস, কবির ছায়া আমি মন থেকে সরাতে পারবনা রে! কিন্তু এই অপর্ণাও আমার কম আপন নয়।

তপতী অপর্ণার চিবুক স্পর্শ করে পুনরায় বলল—মাঝে মাঝে তোদের দুজনের ছায়া আমার মনের মধ্যে এমন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় যে, আমি আর কাউকে আলাদা করতে পারি না।

দুপুরে মেঝেয বসে সেলাই করতে করতে যখন তাদের দু'জনের মধ্যে এই সব গল্প চলছিল তখন জ্ঞানদা নিচে থেকে উপরে এসে একখানা খামের চিঠি দিয়ে গেল। কবিতার চিঠি। তপতী আহ্লাদে চিঠিখানাব মুখ খুলতে খুলতে বলে উঠল—দেখ্‌ল তো ভগবান মানুষের কথা কেমন করে শুনতে পান। কবিতা আমার কত আপন তা হাতে হাতেই প্রমাণ পেলি তো?

অপর্ণা হেসে জবাব দিল—সত্যি তুমি অবাক করলে।

তপতী অতঃপর চিঠিখানার ভাজ খুলে পড়তে লাগল :—

"সই নিশ্চয়ই তুমি রাগ করে আমার বিয়েতে এলে না। আর এলেনা যখন তখন অত দামী উপহার পাঠাতে গেলে কেন? বাবা তোমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হযেছেন। তুমি একবার আমাদের বাড়ি ঘুরে না গেলে বাবার রাগ যাবে না। আমার বরকে তো চেনই, তাই নতুন করে পরিচয় দিয়ে লাভ নেই। তবে ও যে এত দুষ্টু তা আমার জানা ছিল না। মাঝে মাঝে আমি দেওর-ননদদের কাছে লজ্জায পড়ে যাই।

তোমার রেজাল্ট তো বাড়ি বসেই পেযে গেছ। বিনয়দার অনার্সের রেজাল্ট খুব ভালো হযেছে। শুনলুম সে এখন কলকাতায় কোন্ মেসে থেকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এম-এস-সি পড়ছে। আমার আশা ও একদিন সকলের প্রশংসার পাত্র হবে। ভালো কথা—বিনয়দা যেদিন রেজাল্ট নিতে এসেছিল, আমি দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নিযেছি। আমি আগে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝেছিলুম ওকে তুমি ভালোবাসো……

তপতী চিঠি বন্ধ করে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে আমগাছে দুটো শালিক ঘন হয়ে বসে আছে। ওদের

দিকে তাকিয়ে তার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। কত দূরে কোন্ ঠিকানায় বিনয় থাকে তা সে জানে না, তবুও বিনয়ের মুখখানা তার মনের মুকুরে উঁকি দিতে লাগল। সে চিঠিখানা হাতে ধরে উদাস নয়নে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

অপর্ণা তপতীর অবস্থা দেখে বিস্মিত হল। জিজ্ঞাসা করল—দিদি চিঠিতে কি কোন খারাপ খবর আছে?

তপতী বাস্তবে ফিরে এল। অপর্ণার কথার উত্তরে বলল—নারে, এম নই কবিতার কথা মনে পড়ে ওর জন্য খারাপ লাগছে। আমরা দুজন কাছাকাছি থেকে কত মজা করতুম। কিন্তু এখন আর তা হবার উপায় নেই। মেয়েরা বিয়ের পরেই সকলে ছাড়াছাড় হয়ে যায়। আজ তোকে নিয়ে এত হৈ চৈ করছি, আবার একদিন তোর জন্যও এমনি আমার মনের অবস্থা হবে।

এই সময় জ্ঞানদা এসে টেবিলের উপর জলখাবারের দু'টো থালা রেখে বলে উঠল—সারা দুপুর গল্প করেও কি তোমাদের কথা ফুরাল না? নাও এখন এগুলো খাও, তারপর আমি চুল বেঁধে দেব।

তপতী জলখাবারের থালা সরিয়ে রেখে বলল—এখন আমার খিদে নেই। এগুলো বরং তুমিই খেয়ে নাও পিসি, তারপর আমার চুল বেঁধে দিও।

জ্ঞানদা জবাব দিল—তোমারগুলো খেলে আমার থালা আবার কাকে দেব? ওসব হবে না, তোমার খাবার তুমি খাও; আমি আর ননী নিচেয় গিয়ে খাচ্ছি।

অপর্ণা ওদের কথার মাঝখানে বলে উঠল—পিসি শুধু তপুদির চুল বাঁধলে হবে না—আমার চুলও বেঁধে দিতে হবে।

জ্ঞানদা বলল—আমি কি না বলেছি? তোমাদের খাওয়া নাহলে আমি চুলে হাত দিই কি করে? আমাকে আবার গাই দুইতে হবে।

তপতীর অনুরোধে অপর্ণা পাত্র থেকে লুচি তুলে নিয়ে

তাকে সাহায্য করল। জলখাবার খাওয়া হলে ঘরের বড় আয়নার সামনে বসিয়ে পরিপাটি করে জ্ঞানদা দু'জনের চুল বেঁধে দিল। চুল বাঁধা শেষ হলে তপতী জ্ঞানদাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—আঃ কি চমৎকার তুমি চুল বাঁধতে পার!

—চমৎকার না ছাই! তাহলে আমার কপাল এমন করে পুড়বে কেন? এবার তুমি ছাড় আমি নিচেয় যাই, ওই যে ননী গরু নিয়ে আসছে।

জ্ঞানদা নিচেয় গেলে তপতী ওর সম্পর্কে ভাবতে থাকে। ও হাতের মুঠোয় পেয়েও সব কিছু হারিয়েছে। এ সমাজে মানুষ নামধারী কিছু কিছু জন্তু আছে যারা ন্যায়, নীতি, কর্তব্য-দায়িত্ব নামক বৃত্তিগুলোকে গর্হিত কাজ মনে করে। যারা নিজেদের ইচ্ছে ও প্রবৃত্তির বশে যা খুশি তাই করতে পারে, এদের দলেরই একজন বলাই দাস। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তার সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল জ্ঞানদার। বলাই ঠিকা মজুরিতে শান্তিপুরে তাঁতের কাজ করত। সংসারে অনটন থাকলেও পাবনা কলোনীর ভাড়া করা ছোট ঘরে যৌবনের প্রথম দিনগুলোতে জ্ঞানদা ও বলাইএর সুখের অন্ত ছিল না। বিয়ের একবছর যেতে না যেতেই অসাবধানতার জন্য জ্ঞানদা অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়ল। স্বামী বলাই কথাটা শুনে আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরল। এরপর মাস দুই প্রায়ই মাছ, দুধ, ফল ইত্যাদি ভালো ভালো খাবার বেশি বেশি এনে বলাই জ্ঞানদাকে খাওয়াতে লাগল। জ্ঞানদা মনে মনে ভাবতে লাগল তার মতো সৌভাগ্যবতী বোধ হয় আর কেউ নেই। মাস পাঁচেক বাদে গর্ভের সন্তানের ভালোমন্দ চিন্তা করে জ্ঞানদা যখন বলাইএর সঙ্গে এক শয্যায় শুতে অস্বীকার করল বা তার স্বামীর জৈবিক দাবী পূরণ করতে অপারগ হ'ল তখন থেকে দু'জনের মধ্যে অশান্তি দেখা দিতে লাগল। বলাই ফলমূল বা ভালো খাবার আনা বন্ধ করে দিল। সে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরত। জ্ঞানদা ভাবত, নিশ্চয়ই তাদের ভাবী সন্তানের জন্যই

তার স্বামী বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করছে। কিন্তু একদিন তার সে ভুল ভেঙে গেল। কলোনীর বাসিন্দা বলাইএর সহকর্মী পরিতোষ একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার পথে জ্ঞানদার কাছে এসে বলল—বৌদি আপনাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি ; তার আগে বলুন আপনি বলাইদার বিষয়ে কিছু শুনেছেন কি না ?

জ্ঞানদা পরিতোষের কথা শুনে আঁতকে উঠে জিজ্ঞাসা করল—কি ঠাকুরপো, তোমার দাদার কী হয়েছে ? সে ভাবল বলাইএর কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পরিতোষ বলল—আপনি ভয় পাবেন না, ওর কিছু হয়নি, ও যা করছে তাই বলতে এলাম। আমাদের সঙ্গে কনক মিস্ত্রি বলে একটা মেয়ে কাজ করে। ওকে নিয়ে বলাইদা প্রায়ই সিনেমায় যায়—আরো আরো অনেক ব্যাপার হচ্ছে।

জ্ঞানদা কথাটা শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। বলল—না, না, এ হতে পারে না, তাকে আমি ভালোমতো চিনি, এমন কাজ সে কখনও করতে পারে না।

পরিতোষ বলল—বৌদি আপনি বিশ্বাস না করলেও ঘটনাটা সত্যি। আমি অনেক বারণ করেছি, কিন্তু শোনে না। আমাদের মালিক অভয়বাবু ওকে শাসিয়েছেন এসব করলে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু বলাইদা তোয়াক্কা করে না। বলে—বলাই কারিগরের অত ঠেকা নেই, এক দুয়োর বন্ধ তো হাজার দুয়োর খোলা।

বলাইএর ভরসা সে ভালো কাজ জানে। তার হাতের কাপড়ের খুব নাম। অনেক তাঁতের মালিকরাই তাকে ডাকে।

সেদিন অনেক রাত্রে বলাই বাড়ি ফিরলে জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করল—এত রাত্রি করলে যে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—কাজ ছিল।

—কোথায় কাজ ছিল ?

—কোথায় আবার যেখানে কাজ থাকে।

—মিথ্যে বলার আর জায়গা পেলে না? কোথায় ছিলে এবং কার সঙ্গে ছিলে এসব জানতে আমার আর বাকী নেই। আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে তোমার জন্য পথ চেয়ে রাত জেগে বসে থাকি, আর তুমি কিনা আমাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াও—তোমার বিবেকে একটুও বাধে না?

—কি বললি হারামজাদী? যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা। বলাই জ্ঞানদার চুলের মুঠি ধরে তাকে এলোপাথাড়ি কিল-চড় মারতে লাগল। তারপর মেঝেয় ঠেলে ফেলে দিয়ে বলল—যখন জেনেছিস তখন ভালো করে শুনে রাখ, ওকে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করব। তোর পোষায় এখানে থাকবি, না পোষায় যেখানে পারিস চলে যা।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঝগড়া এবং অবশেষে হাতে-পায়ে ধরা বা কান্নাকাটি করেও জ্ঞানদা বলাইএর বিবেককে জাগ্রত করতে পারেনি। কয়েকদিন পর তার বাবা নিতে এলে সে বাবার সঙ্গে চলে গেল। কয়েকমাস পর বাপের বাড়িতে জ্ঞানদা যে কন্যা সন্তানটি প্রসব করেছিল সে ছিল যেমন রুগ্ন—তেমনি তার ডান পা টা ছিল পঙ্গু। বলাই তার খোঁজ-খবর নিচ্ছেনা দেখে ছ'মাসের মেয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে জ্ঞানদা শান্তিপুরে গিয়ে অপ্রস্তুত হ'ল। শুনতে পেল, বাড়িওয়ালা বলাইএর অবৈধ কার্যকলাপে বাধা দেওয়ায় সে মাস তিনেক আগে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। জ্ঞানদার বাবা হরিহর বিশ্বাস তাঁতের মালিক অভয়বাবুর বাড়ি গিয়ে শুনলেন, বলাই কনককে নিয়ে শান্তিপুর ছেড়ে অন্য কোথায় চলে গেছে। সব শুনে জ্ঞানদা বুঝল, তার ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগার কোন সম্ভাবনা নেই। সে বাবার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে নোকরীর বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল।

এরপর জীবনের উপর দিয়ে কয়েকটা বছরের চাকা জ্ঞানদাকে মাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে তার বাবা-মা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মারা গেছে তার কোলের প্রতিবন্ধী শিশুটিও।

সব গেলেও যা তার সঙ্গী হয়ে রইল তা হল—সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা এবং তার শরীরের প্রতি একদল বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষের শ্যেণ দৃষ্টি। এ সমাজে কোন নারী দুর্বিপাকে পড়লে তাকে সাহায্যকারী ব্যক্তির বিশেষ অভাব হয় না—বিশেষতঃ সে নারীর যদি যৌবন অটুট থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় অভাবী ঘরের মেয়ে হলেও জ্ঞানদার এ সকল ছিল। নিজের স্বামীর চরিত্রের স্বরূপ দেখে গোটা পুরুষ জাতিকে সে ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছিল। তাই তার দুর্দিনে যখনই কেউ কোন সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাকেই সে সন্দেহ করে দূরে থেকেছে। কিন্তু পেটের খিদে বড় শত্রু। সে ন্যায় অন্যায় বোঝে না। বেঁচে থাকতে হলে এ দাবীকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

জ্ঞানদা যখন নিজের জীবন ও জীবিকা নির্বাচন নিয়ে বড়ই দিশেহারা তখনই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার কাছে জানতে পারল, মহিমবাবু মা মরা মেয়ে তপতীকে লালন-পালনের জন্য একজন নিঝঞ্ঝাট মহিলা খুঁজছেন। অনেক ভাবনা চিন্তা করে অবশেষে অদৃষ্টকে সাক্ষী মেনে জ্ঞানদা মহিমবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। সব কথা শুনে মেয়েছেলে-বিহীন বাড়িতে মহিমবাবুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে তার যথেষ্ট আপত্তি থাকলেও শৈশবের মেয়ে তপতীর মায়ার কাছে সে হার স্বীকার করল। হারানো মেয়ে লক্ষ্মীর মুখ মনে পড়ে গেল। ঈশ্বর ভরসা করে সে এ বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করল। প্রথম প্রথম মহিমবাবুর কাছাকাছি হতে তার ভয় করত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর চরিত্রমাধুর্য জ্ঞানদার সকল সংশয় দূর করে দিল। সে মহিমবাবুকে দাদার আসনে বসিয়ে তপতীর সঙ্গে তাঁর সেবার ভারও নিজের হাতে তুলে নিল।

প্রথম প্রথম সে মাইনে নিয়ে জমিয়ে রাখত। পরে যখন সে এবাড়িরই একজন হয়ে উঠল তখন টাকা নেওয়া বন্ধ করল।

বরং এতদিনে যে টাকা পেয়েছিল তা দিয়ে তপতীর জন্য এটা-সেটা কিনে খরচ করতে লাগল।

তপতী কোনদিনই কাজের লোক মনে করে জ্ঞানদাকে অবজ্ঞা করেনি। মাতৃজ্ঞানে জ্ঞানদার বুকে সঞ্চিত স্নেহসুধা আব্দারের সুরেই বরং আদায় করে নিয়েছে।

১৪

কয়েকটি বছর কলকাতা থেকে এম-এস-সি পাসের প্রমাণ-পত্র হস্তগত করে এবং হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় পারদর্শী হয়ে বিনয় আড়ংঘাটা ফিরে এসেছে। তাকে কাছে পেয়ে পিসিমা, পিসেমশাই ও পারুল সকলেই গর্বিত। তাদের বংশে এতখানি লেখাপড়া আর কেউ করে নি। বিনয় দিন কয়েক বিশ্রাম নিয়ে হাঁপিয়ে উঠল। আপাততঃ তার হাতে কিছু পয়সার প্রয়োজন। কিন্তু সে পয়সা কোন্ পথে আসবে তা সে ভেবে পায় না। সে এখানে ওখানে চাকরির সন্ধান করতে লাগল। কিছুদিন পর একদিন খবরের কাগজে দেখতে পেল চন্দননগর হাই স্কুলে মাত্র তিন মাসের জন্য অস্থায়ী একজন অঙ্কের শিক্ষক নেওয়া হবে। চন্দননগর নামটা দেখে তার হৃদয় নেচে উঠল। এই গ্রামেই সে একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সেখানে তার বসবাস করার সুযোগ হয় নি। চূর্ণীর তীরে তাদের ভিটে-মাটি এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। নিজের গ্রামখানি দেখার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিনয় তাড়াতাড়ি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে জবাবের প্রত্যাশায় দিন গুনতে লাগল।

ষোল-সতেরদিন পর "ইন্টারভিউ"এর ডাক এল। আশায় উৎফুল্ল হয়ে বিনয় স্টেশনে গিয়ে বানপুরে লোকালে চেপে বসল।

পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি দেখে আসার উদ্দেশ্যে পিসিমা চপলাও বিনয়ের সহযাত্রীনী হয়েছেন। মাজদিয়া স্টেশনে নেমে তারপর বাসে ও রিক্সায় বেলা ন'টা নাগাদ তারা চন্দননগর স্কুলে পৌঁছুল। ঘণ্টা দুই সময় হাতে রয়েছে। মিনিট দশ-বারো কাঁচা পথ হেঁটে পুব দিকে চূর্ণীর কিনারে একটা জঙ্গলময় পোড়ো বাড়ির সামনে এসে বিনয়রা দাঁড়াল।

ওপাশে রায়েদের বাড়ির বড় বৌ রেখা চপলাকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে আলাপ জুড়ে দিল। এদেরকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ণ করল।

পিসিমাকে রায়েদের বাড়িতে রেখে বিনয় ঘণ্টা দেড়েক পরে স্কুলে পৌঁছুল। দেখল, মাজদিয়া, কৃষ্ণনগর, খাল-বোয়ালিয়া, হাঁসখালি প্রভৃতি অঞ্চলের পঁচিশ-ছাব্বিশ জন ছেলেমেযে প্রার্থী রূপে এসেছে। একে কমই বলতে হয়। চাকরির যা বাজার তাতে এই অস্থায়ী সাময়িক পদটির জন্য যদি চব্বিশ-পঁচিশ'শ ছেলেমেয়ে আসত তাহলেও বিনয়ের আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। তার ভাগ্যে পদটি জোটার কোন সম্ভাবনা নেই একথা ধরে নিয়েই বিনয় অপেক্ষা করতে লাগল।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বিনয়ের ডাক পড়লে সে দুরু দুরু বক্ষে মায়ের নাম স্মরণ করে ভিতরে ঢুকল। ছয়-সাতজন মাস্টারমশাই অর্ধচন্দ্রাকারে বসে আছেন। একের পর এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিনয় একে একে সকলের জবাব দিচ্ছে। অবশেষে হেড মাস্টার ব্রজোগোপালবাবু বললেন—আমাদের চাহিদা ছিল বি-এস-সি অনার্স। কিন্তু আপনার তার বেশি ডিগ্রী রয়েছে। এই পাড়াগাঁয়ে কি আপনি আসতে রাজী আছেন? মানে যাতায়াত করবেন কি করে?

বিনয় মার্জিতভাবে জবাব দিল—যদি দয়া করে আমাকে

সুযোগ দেন—তাহলে আসাটা আমার পক্ষে কোন সমস্যাই নয়; তাছাড়া এখানে আমাদের বাড়ি আছে।

—এখানে কোথায়?

—বিশ্বনাথ রায়ের বাড়ির ওপাশে বুদ্ধদেব মাস্টারের বাড়ি।

—তাই নাকি? তুমি বুদ্ধদেববাবুর ছেলে? কিন্তু ও বাড়িতে তো বাস করা যাবে না!

—হ্যাঁ, বিনয় ছোট্ট জবাব দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রজবাবু বলতে লাগলেন— বুদ্ধদেববাবুর অনেক গল্প শুনেছি আমি। বেশ ভালো লোক ছিলেন। ব্রজবাবু একটু চুপ করে কি ভাবলেন তারপর আবার বললেন—মাত্র তিন মাসের জন্য এই 'ভ্যাকান্সি', আমাদের অঙ্কের মাস্টার প্রফুল্লবাবু ট্রেনিং নিতে যাচ্ছেন। উনি ফিরে এলেই আপনাকে বসিয়ে দেওয়া হবে।

—বেশ তাই হবে।

বিনয়ের কথা শুনে ব্রজবাবু বললেন—আপনাকে পাকা কথা দিতে পারছি না। আমাদের মাস্টারমশাই এবং স্কুল কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে দেখি—তারপর চিঠি দিয়ে জানাব।

বিনয় নমস্কার জানিয়ে খুশি মনে বাইরে বেরিয়ে এল। বেলা প্রায় একটা বাজে। তাড়াতাড়ি রায়েদের বাড়ি পৌঁছে দেখল, সেখানে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাধ্য হয়ে তারা আহারাদি সেরে দুপুরের পরে আড়ংঘাটার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

মাসখানেক পরে বিনয় খামের চিঠি পেল। আগামী মাসের পয়লা তারিখে তাকে স্কুলে যোগদান করতে বলা

হয়েছে। পদটি তিনমাসের জন্য সে কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অবনীবাবু চিঠি পড়ে বললেন—বাবা বিনয়, এতদিনে আমার মনের আশা পূর্ণ হল। তুই মাস্টার হবি—কত ছেলেমেয়ে তোর হাতে মানুষ হবে, এ আমার কত গর্বের সে আর কি বলব!

বিনয় উত্তর দিল—মাত্র তো তিন মাসের জন্য

—বাবা প্রথমে এমনি করেই হয়। আস্তে আস্তে সব সুযোগ সুবিধা আয়ত্ত হবে। মানুষ কি একলাফে গাছের মগ্ ডালে ওঠে? তাকে কষ্ট করে একটু একটু করে উঠতে হয়।

পিসেমশাই এর কথায় বিনয়ের প্রাণ ভরে গেল। সে বেশ উৎসাহ পেল। যাত্রার দিন ভোরে উঠে চপলা ভাত রান্না করে দিলেন। বিনয় চূর্ণী থেকে স্নান করে এসে গরম ভাত খেয়ে ট্রেন ধরতে চলেছে। অবনীবাবু ও পারুল ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছে। বিনয় গাড়িতে উঠলে পারুল বলল—দাদা, আমাদের কথা ভুলে যেওনা যেন, মাঝে মাঝে চিঠি দিও।

বিনয় উত্তর দিল—পাকা বুড়ি, তুই চুপ কর। তোর দাদা তিন মাসের জন্য চাকরি করতে গিয়ে হারিয়ে যাবে না, তাকে আবার তোদের কাছেই ফিরে আসতে হবে। তাদের কথা শেষ হবার আগেই ট্রেন হুইসেল দিয়ে ছেড়ে দিল।

বিনয় স্কুলে পৌঁছে ব্রজগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে তিনি বলে উঠলেন—এসে গেছেন? এখানে বসুন। আমি কালীকে ডাকছি, ও আপনার ঘর দেখিয়ে দেবে। আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন, প্রফুল্লবাবু এলে ডেকে পাঠাব। এখানে তো কোন হোটেল নেই. আপনাকে রান্না করে খেতে

হবে। অবশ্য আমাদের ক্লার্ক ক্ষিতীশবাবুর বাড়িতে টাকা দিয়ে কেউ কেউ খান, আমি তাঁকেও খবর পাঠাচ্ছি—আপনি কথা বলে নেবেন। বিনয়ের সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি হাঁক দিলেন—ও কালী কালী ?

কালী ওরফে স্কুলের পিয়ন কালীপদ হালদার ডাক শুনে কাছে এলে ব্রজবাবু বললেন—ইনি আমাদের নতুন অঙ্কের মাস্টার, ওনার থাকার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে এস। আর যা যা দরকার একটু দেখেশুনে দিও। উনি অসুবিধায় পড়লে আমাদের স্কুলের বদনাম হবে। আর অঙ্কের মাস্টার পাওয়া বড় সোজা কথা নয়।

ব্রজবাবুর প্রত্যেকটি কথায় আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে বিনয়ের মন ভরে উঠল। সে কালীপদকে অনুসরণ করে পিছনের বাড়ির একটা ঘরে এল। মাঝারি আয়তনের ঘরে একখানা তক্তপোষ, একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার রয়েছে। বিনয়ের জন্য ব্রজবাবু আগেই ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিলেন। তক্তপোষখানা আর একবার ঝেড়ে নিয়ে বিনয় তাতে শতরঞ্জি পাতল। পাঁচটি টাকা কালীপদর হাতে দিয়ে তাকে পাঠাল একটা মাটির কুঁজো ও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস আনতে।

প্রায় একঘণ্টা পরে হেডমাস্টার বিনয়কে ডেকে পাঠালেন। অন্যান্য মাস্টারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিনয় প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে ক্লাসের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তার ঘরে ফিরে এল। হেডমাস্টার আজ তাকে ছুটি দিয়েছেন। কাল থেকে তার যথানিয়মে ক্লাস নিতে হবে।

বিনয় ক্ষিতীশবাবুর বাড়ি দুপুরের আহার সেরে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বিশ্রাম করল। বিকালবেলা এককাপ চা খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরে দেখতে লাগল। পিসিমার কাছে সে

এই স্কুল সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে। সে সামনের দিক এসে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত কামাক্ষ্যাচরণ নাগ মহাশয়ের মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়াল। তাঁকে তার অন্তরের সবটুকু ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করল। নিজের অধ্যবসায়গুণে এই লোকটি একদিন কত বড় হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন বাগেরহাট কলেজের খ্যাতিমান অধ্যক্ষ। অমায়িক নাগ মহাশয় কত দরিদ্র ছেলেমেয়েকে সাহায্য দিয়ে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছেন তার হিসেব নেই। তাঁর দরদী মন এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠান করেছিলে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এটি একদিন বহুমুখী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় রূপে দেশের ছেলেমেয়েদেরকে গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করবে। পরবর্তীকালে এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন জ্যোৎস্না মজুমদার, তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো উদারপ্রাণ ব্যক্তিরা। এঁরা চেষ্টা করে গেছেন ধনী গরীব, উঁচু-নিচু সকল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা যাতে প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ পায়। এখানে দূর-দূরান্তর থেকে ছাত্ররা এসে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে মানুষ হয়ে গেছে। অনেক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী শুধু লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে এমন নয়, তারা বিনা পয়সায় থাকা খাওয়া এবং জামাকাপড় পর্যন্ত পেয়েছে। দুঃখের বিষয় সেই হোস্টেলটা চূর্ণীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সাক্ষী স্বরূপ ফাঁসী দেওয়া বকুল গাছটা এখনও অতীতের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনয়ের পিসিমা এই স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। তার সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন জ্যোৎস্না মজুমদার। তাঁর নামে এখনও চপলা প্রণিপাত করেন। পিসিমার মুখে বিনয় আরও শুনেছে সমীর বোসের কথা। উত্তরবঙ্গের ছেলে। এখানে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত। খুব নামকরা ফুটবল প্লেয়ার ছিল।

কিন্তু হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে সকলকে শোকাচ্ছন্ন করে অজানা লোকে পাড়ি দিল। এই স্কুল তাকে আজও ভোলে নি। 'সমীর স্মৃতি শীল্ড্' এর সঙ্গে তার নাম চির অক্ষয় হয়ে আছে।

বিনয় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কালীপদর ডাকে ঘরে ফিরে এল। ক্ষিতীশবাবু এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সপ্তাহ খানেক হ'ল বিনয় ক্লাস করাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সে ছাত্রদের মন জয় করে নিয়েছে। যারা অঙ্কে কাঁচা তাদেরকে সে বলেছে—সকাল বা সন্ধ্যার দিকে তারা যেন নির্দ্বিধায় বিনয়ের কাছে আসে, তাদের কোন পয়সা লাগবে না। শেষের কথাটিতে তার জনপ্রিয়তা বহুগুণে বেড়ে গেছে। কারণ, এখানে বেশির ভাগ অভিভাবকের ইচ্ছা থাকলেও গৃহশিক্ষক রেখে ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর ক্ষমতা নেই।

তার ঘোষণার বাস্তবায়ন হতে শুরু করেছে। একটি দু'টি করে ছেলে-মেয়ে আসছে। শুধু অঙ্কের বিষয়ই নয়, অন্যান্য বিষয়েও তারা বিনয়ের সাহায্য নিচ্ছে। বিনয় মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে এই স্কুলটিতে। তার শিক্ষকতার মেয়াদ অতি অল্প-কাল জেনেও সে এগুলো করছে। সে ছোট-বড় সকলের মনের কাছাকাছি পৌঁছুতে চায়। বিনয় মনে মনে ঠিক করেছে, এখানকার চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও সে আর আড়ংঘাটা ফিরে গিয়ে পিসেমশাই এর গলগ্রহ হবে না। হঠাৎ তার মনে এক কঠোর বাসনা জেগেছে। তার মা মরণের আগে একদিন আদর করে তাকে বলেছিল—"বাবা বিনয়, যদি কখনও মানুষ হ'স, তাহলে তোর দেশবাসীকে ভুলে যাসনে, যতটুকু পারিস—যেভাবে পারিস, তাদেরকে সেবা করিস। জেনে রাখ—পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া এ পৃথিবীতে কারো বাস সহজ হয় না, সুখের হয় না। মানুষের কাছ থেকে শুধু নেওয়া নয়, সাধ্যমত দিতেও

হয়; এ দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে ঘোরতর অন্যায় করা হয় মনে রাখিস।”

সত্যিই তো তার পিসেমশাই, পরবর্তীকালে দিলীপ, ভৈরব এরা পর্যায়ক্রমে সাহায্য না করলে তার পক্ষে এতখানি উন্নতি করা সম্ভব ছিল কি? বিনয় ভেবে মনে মনে ঠিক করেছে— কি তার লেখাপড়া দিয়ে, কি তার ডাক্তারী বিদ্যা দিয়ে যতখানি সম্ভব সে সমাজের সেবা করে যাবে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বর্গত কামাখ্যা চরণ নাগ, জ্যোৎস্না মজুমদার, তারক গাঙ্গুলির মতো মানুষ, যাঁরা দেশের অগনিত মানুষকে শিক্ষিত করার কাজে জীবনপাত করে গেছেন। আজও এই ভারতের বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই নিরক্ষর। বিনয়ের ব্রত হল—কৃষক, মজুর ব্যবসায়ী, বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাঁরা নানা কারণে আজও অক্ষর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন, তাঁদেরকে সাক্ষর করে তোলা। এতে যদি তার অনাহারে থাকতে হয় তাতেও সে পিছ্‌পা হবে না।

বিনয় স্কুলের ক্লাস, অন্য সময়ে ছেলে-মেয়েদের পড়ানো ছাড়াও বাড়তি একটি কাজে হাত দিয়েছে। তা হল—প্রতিদিন এক-দু'ঘণ্টা গিয়ে তার বাড়ির জঙ্গল পরিস্কার করা। উদ্দেশ্য কিছু টাকা পয়সা হাতে এলে সে বাড়িটা সারিয়ে বসবাসযোগ্য করে তুলবে। স্কুলের মেয়াদ শেষ হলে এই বাড়িতে বসেই সে তার আরাধ্য কাজের গোড়াপত্তন করবে।

১৫

হরিপদর চিঠি পেয়ে তপতী রাণাঘাট গিয়েছিল। এমনি দু'এক মাস ছাড়া রাণাঘাট গিয়ে সে কাঠগোলা বিক্রীর টাকা নিয়ে আসে। নগদ টাকা বড একটা বয়ে আনে না। টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে নিজের নামে ড্রাফ্ট কিনে এখানে কৃষ্ণগঞ্জের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাঙিয়ে নেয়। রাণাঘাট থেকে ফেরার পথে সে দেখল, আকাশে মেঘ জমছে। যখন সে চন্দননগর খেয়া-ঘাটে পৌঁছুল তখন প্রায় সন্ধ্যা। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। গত কয়েকদিন যাবৎ এ বছরে এমনি অনিয়ম হচ্ছে। খেয়া নৌকা ওপারে গিয়ে আর ফিরে আসছে না। নিরুপায় তপতী এগিয়ে গিয়ে স্কুল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে স্কুল বারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বাতাসের দাপটে বৃষ্টির ছাট্ এসে তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তার ভয় ভয় করছে। কোথায় আশ্রয় নেবে ভেবে পাচ্ছে না।

এই সময় একটি নয়-দশ বছরের ছেলে ছাতা নিয়ে তপতীর কাছে এসে বলল—আপনি এখানে দাড়িয়ে ভিজবেন না, ভেতরে আসুন, মাস্টারমশাই আপনাকে ডাকছেন।

তপতী একটু ইতস্তত করে অবশেষে ছেলেটির ছাতার মধ্যে গিয়ে চুপ করে তাকে অনুসরণ করল। বাঁদিক ঘুরে একটা ঘরে এসে দেখল, বিছানার উপর ধুতি-পাঞ্জাবী পরা এক সৌম্য যুবক বসে আছে। তার মুখে একরাশ দাড়ি-গোঁফ থাকায় আসল চেহারা চেনার উপায় নেই।

যুবকটি মৃদু হেসে বলল—ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন তাই ভেতরে ডেকে পাঠালুম। যদি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে ক্ষমা করবেন আশা করি। এখানে কোন স্ত্রীলোক থাকে না, তাই আপনাকে জামা-কাপড় দিয়ে সাহায্য করতে পারব না।

তবে যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার ধোয়া কাপড় পরে পাখা চালিয়ে ওগুলো শুকিয়ে নিতে পারেন। আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, আপনি দরজায় খিল দিয়ে কাজগুলো সেরে নিন—কেমন ?

—আপনারা ভিজে যাবেন যে !

—না, এদিকটায় বৃষ্টির ছাট্ আসছে না। যুবকটি স্যুটকেস থেকে ধুতি ও তোয়ালে বের করে দিয়ে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল : তারপর ভাবতে লাগল, তপতী এসময় কোথা থেকে এল ? তবে কি ওদের বাড়ি এখানে কাছেই কোথাও ?

তপতী দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ভেজা কাপড-জামা ঘরের মধ্যে মেলে দিয়ে চেয়ারে বসে ভাবছে—কে এই যুবক ? ওর দৃষ্টিতে কোন লালসা নেই অথচ ব্যবহারের চমৎকারিত্ব তার হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত নাড়া দিচ্ছে। এমন ব্যবহার একমাত্র বিনয়ের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সে এখানে কি করে এল ? তবে কি মাস্টারী পেয়েছে ? তার বাড়ির এত কাছে ? পাখার হাওয়ায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তার শাড়ী-ব্লাউজ শুকিয়ে গেল। তপতী সেগুলো পরে দরজা খুলে দিয়ে বলল—আপনারা এবার ভেতরে আসুন।

যুবকটি ঘরে ঢুকে স্টোভ ধরানোর চেষ্টা করতেই তপতী বাধা দিল—ও কি করছেন ? আগে বসুন, একটু আলাপ-পরিচয় হোক—তারপর আতিথেয়তা দেখাবেন।

যুবকটি জবাব দিল—আলাপ-পরিচয় তো মুখে হবে, স্টোভ কোন বাধা দেবে না। একটুখানি চা করব শুধু।

তপতী এগিয়ে গিয়ে বলল—তাহলে আমি করছি, আপনি বসুন।

—না না তা কি করে হয় ? আপনি আমার অতিথি, এখানে প্রথম এলেন……

—হলেও বা, ওটা আমাদের বিভাগ। আপনি ছাড়ুন, ওখানে চেয়ারে বসুন।

এই সময় বাচ্চা ছেলেটা এগিয়ে এসে বলল—মাস্টারমশাই আপনারা বসুন, আমি চা করে দিচ্ছি।

যুবকটি বলল—সেই ভালো মহেশ তুই চা কর, আমরা কথা বলি।

ওরা দুজনে কাছাকাছি বসল। তপতী বলল—আমার অপরাধ নেবেন না, আমি যাকে অনুমান করছি আপনি কি তিনি?

যুবকটি হেসে জবাব দিল—কাকে অনুমান করছেন সেটা না জানলে কি করে বলি বলুন!

—একজনের সঙ্গে আমি কলেজে পড়াশুনা করেছি। বছর পাঁচেক তাকে দেখি না। আগে সে কখনও দাড়ি রাখত না। এখন রাখে কিনা তাও জানি না—তবে আপনার চেহারার সঙ্গে তার বেশ মিল দেখতে পাচ্ছি। একবার তাকে আমি অপমান করেছিলুম।

—শুধু অপমান, আর কিছু নয়?

—তাকে কাছে পেলে বলব। তপতীর ছোট্ট উত্তর।

—মাত্র পাঁচ বছরে তার চেহারা বেমালুম ভুলে গেলেন?

—ভুলে গেছি একথা কে বলল? ভুলিনি বলেই তো চেহারার সাদৃশ্য দেখে আপনার মধ্যে তাকে খুঁজে পেতে চাইছি। আপনি এই স্কুলে কতদিন আছেন?

—মাস দুয়েক হল।

—এর আগে কোথায় ছিলেন?

—কলকাতায় পড়াশুনা করছিলুম।

—ওখানে কি পড়ছিলেন?

—এম-এস-সি।

—কলেজের পড়াশুনা কোথায় করেছেন?

তপতীর কথার জবাব দেওয়ার আগেই মহেশ চা-বিস্কুট এনে টেবিলের উপর রাখল। যুবকটি বলল—আগে চা খান তারপর বলছি সব। সে মহেশকে বলল—ওই কৌটায় মুড়ি আছে তেল দিয়ে মেখে ওনাকে দে, উনি বোধহয় অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।

তপতী আপত্তি জানিয়ে বলল—না না, ওসবের দরকার নেই। আমার কোন খিদে নেই।

যুবকটি বলল—মুড়ি খেতে বেশি খিদের প্রয়োজন হয় না। আর এও জানি খিদে পেলেও আমাদের দেশের মেয়েরা তা কখনও বাইরের কারো কাছে প্রকাশ করে না।

—আপনি কি করে জানলেন?

—অভিজ্ঞতা দিয়ে।

—কাকে দেখেছেন?

—মা, পিসি, আর এই আপনাকে দেখছি।

—আপনি এক নম্বরের মিথ্যুক!

—মিথ্যুক কে সে নিজেই ভালো জানে।

কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে যুবকটি খাটের তলা থেকে কৌটা টেনে বের করে বাটিতে মুড়ি ঢালতে গেলে তপতী তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে ঢালল। তারপর এক টুকরো আদা খুঁজে নিয়ে কুচি কুচি করে কেটে তেল দিয়ে মাখল। ততক্ষণে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তপতী চা গরম করে এনে যুবক ও মহেশকে খেতে দিয়ে নিজে বিস্কুট সরিয়ে রেখে মুড়ি আর চা খেতে লাগল। একটুখানি চুপ করে থেকে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, বিনয়বাবু, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আপনার সঙ্গে এত কাছাকাছি এমন ভাবে দেখা হবে। আপনি মাস্টার হয়ে এখানে আসায় আমার এত আনন্দ হচ্ছে সে আর কি বলব… ..

বিনয় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জবাব দিল—মাত্র তিন মাসের জন্য "ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে" কাজ করছি। এর মধ্যে

দু'মাস কেটে গেছে। আর একমাস পরে প্রফুল্লবাবু ট্রেনিং থেকে ফিরে এলেই আমি "ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন।"

—ওহ্ তাই নাকি? তাহলে তো মুস্কিলের কথা! তপতীর আনন্দের নিরানব্বুই ভাগ যেন কমে গেল। সে ভাবতে লাগল ঈশ্বর এমন কিছু করতে পারেন না যাতে বিনয়কে এখানে আরো কিছুদিন আট্‌কে রাখা যায়।

অন্যান্য গল্প ও দ্বিতীয়বার চায়ের পাট চুকলে তপতী হাতের ঘড়ি দেখে বলল—কি করি বলুন তো—রাত্রি আটটা বাজল, এখনও বৃষ্টি থামল না; বাড়ি পৌঁছুব কি করে?

বিনয় জানালা দিয়ে একবার বৃষ্টির অবস্থা দেখে নিয়ে বলল, আর কিছুক্ষণ দেখা যাক, যদি নিতান্তই না ছাড়ে তাহলে নিখিলবাবুর কোয়ার্টারে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। উনি 'ফ্যামিলী' নিয়ে থাকেন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

—সেটা কেমন হবে? উনারা কি ভাববেন? তাছাড়া বাড়িতে সকলে চিন্তায় রয়েছে···

—আপনি তো ইচ্ছা করে এখানে আসেন নি—মানুষ মাত্রেই বিপদ আপদ হতে পারে। আজকের দুর্যোগে অনেককেই অনেক জায়গায় আটকে পড়তে হয়েছে। আপনি কিভাবে এখানে এসেছেন তার বড় সাক্ষী আমার ছাত্র এই মহেশ। আমরা দু'জনে সঙ্গে গিয়ে আপনার বাবাকে বলে আসব কি পরিস্থিতিতে এখানে আট্‌কে পড়েছিলেন।

—সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত, আমাকে বাবা কিছুই বলবেন না। কারণ, তিনি তিন বছর আগে দেহ রেখেছেন।

—তাই নাকি? কি হয়েছিল? কোন খবর পাইনি তো?

—আপনাকে জানানোর সুযোগ হয় নি।

দু'জন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পরে বিনয় বাইরে ঘুরে এসে বলল—বৃষ্টি থেমেছে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—এখন গিয়ে ফিরে আসবেন কি করে ?

—আগে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া আমার একান্ত কর্তব্য, তারপর ওসব কথা ভাবব, আশা করি ফিরে আসতে পারব।

তপতী ভাবল—এরা যদি এগিয়ে না দেয় তাহলে তাকে এখানে পরের বাড়িতে অসুবিধা করে রাত কাটাতে হবে। তার চেয়ে বরং এরা গেলে সে আটকে দেবে। তার বাড়িতে থাকার যথেষ্ট জায়গা আছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—চলুন।

বিনয় ও মহেশ তপতীকে অনুসরণ করে খেয়াঘাটে এসে দাঁড়াল। বিনয় হাঁক দিতে অর্জুন মাঝি কিছুক্ষণ পরে নৌকা এনে কূলে ভিড়াল। ঘাট বড় পিচ্ছিল। তপতী পা রাখতেই তা সরে যাচ্ছে। অবশেষে সে দ্বিধা কাটিয়ে বিনয়কে ধরে ধরে নিচেয় নেমে নৌকায় উঠল।

পার হয়ে এপারে এসে বিনয় অর্জুনকে বলে গেল, ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন অপেক্ষা করে। অর্জুন বিনয় মাস্টারকে চেনে। সে সম্মতি জানাল।

ঘাটের উপরে উঠে এসে ওরা কাঁচা রাস্তায় হাঁটছে। বিনয় একহাতে মহেশকে ধরে রেখে অন্য হাতে টর্চের আলো জ্বালছে। সে আলোয় তপতী পিছল পথে বিনয়ের কাছাকাছি হয়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে বিনয়ের শরীরের স্পর্শ পেয়ে তার শরীর ও মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। আজ দুর্যোগের রাতে তার এমন পথের সাথী জুটতে পারে সে জীবনে কখনও ভাবেনি। তার কত যে আশা-আকাঙ্খা মনের দিগন্তে নেচে গেয়ে ফিরছে তা সে কাউকেই প্রকাশ করতে পারবে না।

কড়া নাড়তে জ্ঞানদা এসে দরজা খুলে দিল। তপতী ভেতরে ঢুকে বলল—দেখ পিসি কাকে ধরে এনেছি, আমার "কলেজ মেট" বিনয়বাবু। চন্দননগর স্কুলের মাস্টার

হয়ে এসেছেন। খেয়া ঘাটে এসে ঝড়-বৃষ্টির মুখে পড়ে ওঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম, নইলে জানতেই পারতুম না উনি এখানে আছেন।

জ্ঞানদা জবাব দিল—ওঁদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? আগে ঘরে নিয়ে বসতে দাও!

তপতীর পরিবর্তে বিনয় জবাব দিল—আমরা এক্ষুনি ফিরে যাব, অন্ধকার পথ, ব'সিয়ে আজ আর দেরি করাবেন না।

জ্ঞানদা বলল—না গেলে হবে না? রাত্রে এখানে থেকে কাল সকালে গেলে কি হয় না?

বিনয় হেসে বলল—না, তা হবার উপায় নেই, অর্জুন আমাদের জন্য বাড়ি যেতে পারছে না, ওকে অপেক্ষা করতে বলে এসেছি। তাছাড়া মহেশের মা-বাবাও চিন্তা করছেন, ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।

জ্ঞানদা তপতীর উদ্দেশ্যে বলল—ঠিক আছে অন্তত পক্ষে পাঁচ মিনিটের জন্য এই ঘরে বসাও—আমি আসছি। সে ছুটে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল এবং দুই বাটিতে দুধ-চিঁড়ে এনে বিনয় ও মহেশকে খেতে দিল।

বিনয় তপতীর দিকে তাকাতে সে জবাব দিল—দেখুন আমি পিসিকে কিছুই বলিনি, আর এমন বেশি কিছু নয় যে খেতে কোন অসুবিধা হবে।

বিনয় বলল—এখন ফিরে গিয়ে ক্ষিতীশ বাবুর বাড়িতে খেতে হবে, আমি দু'বেলা ওখানেই খাই।

—ঠিক আছে, আজ গিয়ে কম খাবেন।

তপতীর কথার প্রতিবাদ করা নিরর্থক বিবেচনা করে বিনয় কিছু চিঁড়ে মহেশের বাটিতে তুলে দিয়ে চুপ করে খেতে লাগল।

যাবার সময় তপতী বলল—আজ বেশি কথা হ'ল না। পরশু রবিবারে সকালে আপনি এখানে আসবেন, সারাদিন থাকতে হবে।

—আমি খুবই দুঃখিত যে, ওই দিনে আমার আসা সম্ভব হবে না। ছুটির দিনগুলোতে আমাকে কিছু কাজ করতে হচ্ছে। একটা মতলব মাথায় এসেছে, তারই প্রস্তুতি পর্বে মেতে আছি, জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে।

—আমাকে কি বলা যায় না ?

—বলব। তবে এখন নয়, খানিকটা এগিয়ে নিই।

—তবে যে কোনদিন—যে কোন সময় সুযোগ মতো চলে আসবেন, আমরা অপেক্ষায় থাকব।

—আচ্ছা চেষ্টা করব। বিনয় মহেশের হাত ধরে পথে পা বাড়াল।

১৬

সে রাত্রে খুশির স্রোতে অবগাহন করতে করতে তপতী এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নানা প্রকার সুখের স্বপ্নে মাঝে মাঝে ঘুমের ব্যাঘাত হলেও তার মন আনন্দে ভরপুর। ভোর বেলা সকলের ওঠার আগে সে হাতমুখ ধুয়ে তানপুরা নিয়ে বসল। প্রথমে সরস্বতী বন্দনা করে সে ভৈরবী রাগে গান ধরল :

আজি এলে বুঝি দ্বারে
মম চির চেনা সেই অতিথি।
তব আগমনে ভরিল কুসুমে—
মম হৃদয় কানন বীথি ॥
তব আগমনে জাগে পুবে উষা,
কাটে মম ঘোর তমসা নিশা ;
প্রাণে জাগে প্রণয় পিপাসা—
শুনি কুহু কোকিলের গীতি ॥

তব আগমনে বুঝি আসিবে সুদিন,
বাজিবে না আর বেদনার বীণ;
শুধিব মম প্রণয়ের ঋণ—
জাগিছে পরাণে এ প্রতীতি ॥

রবিবার দিন বিকাল বেলা তপতী যখন বিনয়ের স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবছে তখন দয়াময়বাবু নিচেয় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল—মা জননী, বাড়িতে আছ নাকি?

তপতী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাড়া দিল হ্যাঁ আছি।

দয়াময়বাবু সিঁড়ি ভেঙে উপরে এসে বললেন—তুমি কেমন আছ মা?

তপতী দয়াময়বাবুকে ঘরে বসিয়ে জবাব দিল—আমি ভালো আছি, আপনি?

—আমাদের কথা দেড়ে দাও মা, বুড়ো হাড়ে যে ক'দিন টিঁকে আছি সেটাই যথেষ্ট, খারাপ-ভালোর বিচার এখন অবাস্তর মা। তবে শরীরটা কেমন যেন ভোগাচ্ছে। তাই এই ক'দিন আসতে পারিনি।

—আপনাকে না দেখে আমি ভাবছিলুম, হয়তো আপনার কিছু হয়েছে। আজই দুপুর বেলায় অপর্ণাকে বলছিলুম, কাল-পরশু একবার আপনাদের বাড়ির খবরটা নিয়ে আসব। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না।

—সেকি মা এমন সৌভাগ্য লাভ থেকে বুড়ো ছেলেকে বঞ্চিত করবে? না মা, এ বড় অন্যায় হবে! তাছাড়া তোমার কাকীমা কি দোষ করল? সে বেচারী সব সময় তোমার পথ চেয়ে থাকে···

—আচ্ছা তাহলে কাল বিকালের দিকে যাবার চেষ্টা করব।

—চেষ্টা নয় মা, যাবেই—তোমার কাকীমাকে আমি সেই কথাই বলে রাখব।

তপতী হাসল, কোন জবাব দিল না। এরপর বৈষয়িক ব্যাপারে অর্থাৎ জমিতে বীজ বপণ, নিড়ানির কাজ, পুব পাড়ার জমির জবর-দখল, কোর্টের মামলা ইত্যাদি নিয়ে দুজনে প্রায় ঘণ্টা দুই আলোচনা করল।

সন্ধ্যার পরে বৃদ্ধ জলখাবার খেয়ে গাত্রোত্থান করলেন। পা বাড়িয়ে আবার থামলেন। পিছন ফিরে বললেন—মা যাবার মুহূর্তে আবার বলে যাচ্ছি, বুড়ো ছেলের কথাটা ভুলে যেও না যেন।

তপতী হেসে জবাব দিল— আচ্ছা ভুলব না। দয়াময়বাবুকে বিদায় দিযে এসে সে নিজের ঘরে বসে উল্টো-পাল্টা ভাবনার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। তার ভাবনার বিষয় এই দয়াময়-বাবু। লোকটির মধ্যে যতই ক্রুরতা থাকুক স্নেহের অভিনয়ে বোধ হয় তাঁর জুড়ি নেই। হয়তো এর সবটাই মিথ্যে নয়। এমনও হতে পারে তাকে তিনি সত্যিই স্নেহ করেন। কর্তব্যের খাতিরেই একবার ওপারে যাওয়া দরকার। ও বাড়িতে যাওয়া ছাড়া আর একটি কাজ আছে। অনেকদিন হল রাধাবিনোদবাবুর কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার হিসাবে তো বটেই—লোক হিসাবেও তিনি একজন আদর্শ ব্যক্তি, তপতীর হিতৈষীজন।

এই সময় জ্ঞানদা এসে ধমকের সুরে বলল - আজ কিছু পেটে দিতে হবে- না চিন্তায় পেট ভরিয়ে রাত কাটাবে? তুমি বাপু পার, কিন্তু আমার পেটে খিদে হজম হয় না।

তপতী হেসে জবাব দিল—আমারও খিদে হজমের অভ্যাস নেই, চল যাচ্ছি। সে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াল।

পরেরদিন দুপুরের পরে তপতী অপর্ণাকে সঙ্গে করে মন্দিরের ঘাট পার হয়ে ওপারে গেল। রিক্সা করে হাসপাতালে গিয়ে শুনল, রাধাবিনোদবাবু কয়েকমাস আগে মুর্শিদাবাদ বদলি হয়ে গেছেন। খবরটায় তপতীর মন খারাপ হয়ে গেল। অতঃপর

তাদের রিক্সা গিয়ে দাঁড়াল দয়ামযবাবুর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে।

তাদেরকে দেখে দোতলা থেকে দয়ামযবাবু ও মেয়ে কণিকা নিচেয় নেমে এসেছে। বিবাহিতা কণিকা আজ সকালেই বাপের বাড়িতে এসেছে। তপতী সম্পর্কে সে অনেক কথা শুনেছে। এও শুনেছে সত্বরই সুবিধামত দিনে তপতী এ বাড়ির বৌ হয়ে আসছে। সেই জন্য সে যথাসাধ্য বেশি করে আপ্যায়ণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে একেবারে দোতলায় হৃদয়নাথের ঘরে এনে বসিযে হাসি-ঠাট্টায় মজে উঠল। তার কথা-বার্তায় তপতীর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কিন্তু প্রতিবাদ করা সমাচীন নয় মনে করে সে চুপ করে এড়িয়ে যাওযার চেষ্টা করছে।

খানিক বাদে ভাগ্যবালা এ ঘরে এসে বললেন কি রে কণিকা. এখানে ঘাপটি মেরে বসে আছিস কেন? মাকে বাড়ির সব কিছু দেখিযে চিনিয়ে দে!

দযাময়বাবুর এ বাড়িখানা বেশ অর্থ ব্যয় করে মনোরম পরিবেশে করানো হয়েছে। প্রসস্থ অর্গল, মোজাযেক মেঝে, দেয়ালে সুন্দর কারুকার্য, সামনে ফুলের বাগান। এমন সাজানো গোছানো যা সহজেই যে কোন মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। বিশেষ করে যে নববধূ হয়ে এ বাড়িতে আসবে তার তো খুশি হবারই কথা। অথচ তপতীর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মনে হচ্ছে কতক্ষণে এখান থেকে মুক্তি পেয়ে সে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। দয়াময়বাবু যে তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে তপতীর মন ভুলাতে চাইছেন এ কথা এখন সে উপলব্ধি করল।

তপতীর মনের যখন এই অবস্থা তখন হঠাৎ সেখানে হৃদয়-নাথের আবির্ভাব ঘটল। সে যাত্রার ঢঙে উচ্চারণ করল, কখন এসেছ? তোমার চরণধূলি পেয়ে অধীনের কুটীর ধন্য হল!

তপতী জবাব দিল—কাউকে ডেকে আনতে হয়নি, আমি নিজে ইচ্ছে করেই এসেছি।

—তাই তো বলছি, নিজগুণে কৃপা না করলে ক্ষুদ্রের সাধ্য কি তোমাকে নাগাল পায়!

ইতিমধ্যে কণিকা আর অপর্ণা তপতীকে একা রেখে কোথায় চলে গেছে। তপতী মুখ টিপে হেসে বলল—যার উদ্দেশ্যে আপনার এই স্তুতি সে এতই নগণ্য যে ওসবের কোন যোগ্যতাই তার নেই। এসব কথা যথাস্থানে প্রয়োগ করাই বিধেয় বলে মনে করি।

তপতীর কথায় যেন একখণ্ড মেঘ উড়ে এসে হৃদয়নাথের মন-গগন ছেয়ে ফেলল। তপতী যে এমন করে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে তা সে ভাবতে পারেনি। সে মনে মনে বলল—তেজী টাট্টুকে বশ মানাতে সময় লাগে। কিন্তু একবার বশ মানলে তাতে চড়ে আরাম। সে আর কঠিন বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে সহজভাবে বলল—কখন এসেছ? তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ সুস্থ আছি, ঘণ্টাখানেক হ'ল এসেছি। এবার যেতে হবে।

—এরই মধ্যে?

—ঘণ্টাখানেক তো হল। সন্ধ্যা হলে যাব কি করে?

—এই চিন্তা? আমার সঙ্গে তোমাদের যেতে আপত্তি থাকলে বাবা এগিয়ে দিয়ে আসবেন।

কথাটায় হৃদয়নাথের ক্ষুব্ধ অভিমান ঝরে পড়ল। তা অনুভব করে তপতী জবাব দিল—আমি অত ঠুনকো নই যে আপনার সঙ্গে পথে বেরুলেই আমার গায়ে কাদা লাগবে। ইচ্ছা করলে আমি যে কোন ব্যক্তির সাথেই সচ্ছন্দে চলতে পারি।

হৃদয়নাথ একথার জবাব না দিয়ে উচ্চস্বরে বলল—ও কণিকা, চা-টা দিয়েছিস তো?

পাশের ঘর থেকে কণিকার জবাব এল – এখনও দিইনি, মা জলখাবার করছেন।

খানিক বাদে কণিকা জলখাবারের থালা নিয়ে এলে তপতী দেখল লুচি, পায়েস, কয়েকপ্রস্থ মিষ্টিতে থালা ভর্তি। তার আসাকে কেন্দ্র করে এঁরা যে কতখানি আপ্যায়ণ ও মনতুষ্টির ব্যবস্থা করে রেখেছেন তা ভেবে তপতীর দুঃখ হল। সে কোন প্রতিবাদ না করে খান দুই লুচি অপর্ণার থালায় দিয়ে কণিকাকে নিয়ে খেতে বসল।

অতঃপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপর্ণাকে নিয়ে তপতী রাস্তায় নামল। হৃদয়নাথ এগিয়ে এসে বলল—চল, আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।

তপতী সুন্দর করে হেসে জবাব দিল– আপনাকে আর কষ্ট করতে দিচ্ছি না, এখনও অনেক বেলা রয়েছে ; আমাদের যেতে কোন অসুবিধা হবে না।

এরপর আর কথা চলে না। হৃদয়নাথ আর বারান্দায় না দাঁড়িয়ে সোজা ছাদে উঠে গেল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ চোখে ঘুম না এল ঘুরে ফিরে তপতীর হৃদয়দের বাড়ির ঘটনাগুলো মনে পড়ছে। হৃদয়ের যে যে কাজ তার ভালো লাগেনি—আর যে যে কাজ তার মনঃপুত হয়েছে এই দুই তালিকা পাশাপাশি রেখে বারবার তুলনামূলক বিশ্লেষণে নিজেকে ক্লান্ত করে এক সময় অসহায় চিত্তে নিদ্রা-দেবীর কোলে আশ্রয় নিল !

১৭

বিনয় ছুটির দিনগুলোতে পর্যায়ক্রমে নিজে এবং মজুরি দিয়ে দুই একজন লোকের সাহায্যে বাড়ির জঙ্গল কেটে পরিস্কার করেছে। দু'মাসের মাইনে হাতে আসায় কিছু খরচপত্র করে ঘরগুলো কিছুটা সারিয়ে তোলায় বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এবার তার নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ শুরু করার পালা। এই উপলক্ষে সে পিসিমা ও পিসেমশাইকে চিঠি দিল—যাতে তাঁরা তার নব যাত্রার পথে আশীর্বাদ করে যান। আর একমাসও তার স্কুলের চাকরির মেয়াদ নেই--এরপর অনির্দিষ্ট পথে তার একা চলার পালা।

চিঠি পেয়ে চপলা স্বামী-সন্তান নিয়ে ছুটে এসেছেন। বিনয়ের এই সিদ্ধান্তে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। এপাড়া ওপাড়া ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে আছে শম্ভু বিশ্বাস—সে চায়ের দোকানে কাজ করে। ভোম্বলের মা—জাল বোনে। কালু সেখ—পঞ্চাশ বছরের উর্দ্ধে, মাঠে চাষের কাজ করে। গোবর্ধন পাল- ষাট বছরের বৃদ্ধ, হাঁড়ি-কলসী গড়ে। বাইশ বছরের বল্টু দাস—এক মুদিখানার কর্মচারী। এমনি বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ যাদের প্রথম জীবনে সময় ও সুযোগের অভাবে লেখাপড়া তথা অক্ষর জ্ঞান হয়নি– তাদেরকে অক্ষর চিনিয়ে অন্তত পক্ষে চিঠিপত্র লেখা বা হিসাব-নিকাশ করার যোগ্যতা অর্জন করিয়ে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। এদের জন্য পুরানো ও কিছু নতুন বই-খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি বিনয়ই জোগাড় করেছে।

শনিবার দিন কথাটা হেড মাস্টার ব্রজবাবুর কানে যেতে তিনি বিনয়কে ডেকে পাঠালেন। বিনয় নিজের ক্লাস শেষ করে ব্রজবাবুর কাছে গেলে তিনি বললেন—আপনি কত বড় একটা মহান উদ্যোগ নিয়েছেন একথা আগে বলেননি তো ?

বিনয় লজ্জানম্র ভাবে জবাব দিল—এখনও জানানোর মতো তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি—তবে যদি আমার উদ্দেশ্য সফল হয় তাহলে কাউকে জানাতে হবে না, অনেকের সঙ্গে আপনিও একদিন অবশ্যই জানবেন।

ব্রজবাবু মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন—বিনয়বাবু, এমন সমাজ কল্যাণের ব্যাপারটা কি চুপি চুপি করার বিশেষ কোন কারণ আছে ?

বিনয় জবাব দিল—কারণটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। আপনি জিজ্ঞাসা করছেন তাই বলি—আমাদের দেশে অনেক ভালো কাজেরই বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্বোধন হয়, কিন্তু তাদের অনেকগুলোই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না—আবার কিছু অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ··

—ও বুঝেছি, আপনি কাজ করে দেখাতে চান, এই তো ? ভালো কথা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার প্রচেষ্টা সফল হোক।

বিনয় নিচু হয়ে ব্রজবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে এল।

প্রায় দশদিন গত হয়েছে অথচ বিনয় একবারও এদিকে এলনা দেখে তপতী বিস্মিত হল। এক এক করে তার মনের কোণে খারাপ চিন্তাগুলো এসে বাসা বাঁধতে লাগল—কি জানি তার নতুন চাকুরি—কোন কারণে তাকে ছাড়িয়ে দিল না তো ?

রবিবার দিন ঘুম থেকে উঠে চা-জলখাবার খেয়ে তপতী একাই পথে বের হ'ল! খেয়াঘাট পার হয়ে বিনয়ের স্কুলে এ'ল। ঘরে তালা দেখে তার বুকটা চমকে উঠল। তবে কি বিনয় এখানে নেই ? বিনয় যখন গেল না তখন তারই উচিৎ ছিল নিজে এসে বিনয়ের খোঁজ-খবর নেওয়া! এখন সে কি করে বিনয়ের হদিস করবে ভেবে পায়না।

তার মনের যখন এই অবস্থা তখন স্কুলের দারোয়ান এসে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কাকে খুঁজছেন ?

—বিনয় বাবুকে।

—তিনি বাড়িতে গেছেন।

—কবে আসবেন ?

—আজই, খানিক বাদে।

—কোথায় বাড়ি বলতে পারেন ?

—এই গ্রামেই। সামনের ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে পনের-কুড়ি মিনিট লাগে, আপনি যেতে চান ?

—কি করে যাই বলুন, আমি তো পথ চিনি না।

—চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

তপতী হাতে যেন স্বর্গ পেল। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি বিনয় এই গাঁয়েরই ছেলে। দারোয়ান গিয়ে তাকে বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে চলে এ'ল। তপতী দেখল গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে চূর্ণীর ধারে নানারকম গাছ-গাছালির ছায়াকুঞ্জে একখানা টালির ছাউনি দেওয়া ছোট বাড়ি। বারান্দায় বিভিন্ন বয়সের দশ-বারোজন ছেলে-বৌ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পড়াশুনা করছে। তাদের মাঝখানে বিনয় বসে আছে।

দূর থেকে বিনয়ের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সে পিসিমাকে তপতীর আগমন সংবাদ দিল। চপলা তপতীকে ঘরে এনে বসালেন। বিনয়ের এখন ওঠার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে তপতী নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে চপলা ও অবনীবাবুর সঙ্গে কথা বলায় নিযুক্ত হল। পারুল গেল চায়ের যোগাড় করতে।

বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ পড়ানো শেষ হলে বিনয় সকলকে বিদায় দিয়ে ঘরে এলে তপতী অভিযোগ করল—এসব পরিকল্পনার কথা সেদিন বলেননি তো ?

বিনয় মৃদু হেসে জবাব দিল—সেদিন বলার মতো কিছু ছিল না। আজ বলতে পারি—এই কাজটা শুরু করলুম, সকলের শুভেচ্ছা কামনা করি, আপনার কাছেও আমার একই প্রার্থনা।

তপতী জবাবে বলল—বিনয়বাবু, আপনি যা করলেন তার জন্য শুধু শুভেচ্ছা নয়, এর সাথে জানাই আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম অভিনন্দন। সেই সঙ্গে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ, যদি কোন আর্থিক প্রয়োজন দেখা দেয় আশা করি সদ্ব্যয়ের সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

বিনয় হেসে বলল—আচ্ছা তেমন দরকার হলে অবশ্যই জানাব।

—এখন চলি, পিসিমাদের নিয়ে আপনি বিকাল বেলা আমাদের বাড়িতে যাবেন।

বিনয়ের জবাব দিতে হ'ল না। চপলা এগিয়ে এসে বললেন—মা, এবার আর যাওয়া হবে না, আজ দুপুরের পরেই চলে যাচ্ছি। মনে কিছু ক'রো না, পরেরবার এসে নিশ্চয়ই যাব। আর তোমাকে এখন যাওয়া হবে না, আমার রান্না হয়ে গেছে, না খেয়ে যেতে পারবে না।

তপতী আপত্তি জানাল। কিন্তু তার আপত্তি টিঁকল না। পারুল ততক্ষণে তাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছে। অতএব দুপুরে আহারাদির পর চপলার আগেই তপতী বিদায় নিল। কারণ, সে বাড়িতে কিছু বলে আসেনি। সে বাড়ি না ফিরলে জ্ঞানদা খেতে বসবে না।

আড়ংঘাটা ফেরার পথে চপলা মনে মনে সম্ভব অসম্ভব নানা ছবি এঁকে আনন্দিত হচ্ছেন। কখনও স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। অবনীবাবু কিছু মানছেন, কিছু অবিশ্বাসের ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য এইসব আলোচনা তপতী ও বিনয়কে কেন্দ্র করেই।

বিনয় স্কুলের ঘর থেকে বাকী জিনিসগুলো বাড়িতে নিয়ে আসার তাগিদে মহেশকে সঙ্গে করে পথে বের হ'ল। তার মনে সকাল ও দুপুরের স্মৃতি বারবার ওঠানামা করছে।

১৮

বিনয় এখন আর স্কুলের ঘরে থাকে না। ক্লাসের পর নিজের বাড়িতে গিয়ে ছাত্র পড়ায়। অবসর সময়ে ঘুরে ঘুরে পুরানো বই সংগ্রহ করে। ছেঁড়া বই সংস্কার করে। দু'টি একটি করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কিনে এনে প্রয়োজন মতো তার ছাত্রদের বা তাদের পরিবারের লোকজনকে চিকিৎসা করে। প্রথমে সে চিকিৎসার জন্য কোন টাকা-পয়সা নিত না। পরে ব্রজবাবুর উপদেশ মতো যাতে বারবার পকেটের পয়সা খরচ করে ওষুধ কিনতে না হয় এই উদ্দেশ্যে সে মাথাপিছু মাত্র আটআনা চিকিৎসা 'ফি' ধার্য করেছে। ওষুধ কেনার জন্য মাঝে-মধ্যে তাকে কৃষ্ণনগর যেতে হয়। এ ছাড়া কেউ যদি কলকাতা যায় তার মারফৎ "হরেন ব্রাদার্স" থেকে ওষুধ আনায়। বিনয়ের বিশ্বাস—"হরেন ব্রাদার্স"এর ওষুধের দাম একটু বেশি লাগলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। তার স্কুলের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সে এখনও নিযুক্ত আছে। কারণ, প্রফুল্লবাবু ছুটি বাড়িয়েছেন।

সেদিন স্কুল ছুটির পর খেয়াঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে বিনয় বিজয় মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছে এমন সময় একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিল। সে চিঠিখানার ভাজ খুলে দেখল—গোপনীয় কিছু নেই। তপতীর আহ্বান—"যদি কাজের ক্ষতি না একবার আমাদের বাড়িতে আসুন, কিছু কথা আছে।" বিনয় চিন্তা করে দেখল মাত্র তিনটে বাজে। সন্ধ্যা 'ছ'টার আগে আর কোন কাজ নেই। অতএব এখন তিন ঘন্টা অন্যকাজে ব্যয় করা চলে। সে বিজয়বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে খেয়াঘাট পার হয়ে তপতীদের বাড়িতে পৌঁছুল।

তপতী বিনয়কে উপরের ঘরে নিয়ে বসাল। বিনয়ের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল—আগে এই জলখাবারগুলো খেয়ে নিন, আমার সঙ্গে আপনাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

বিনয় বলল—কিন্তু আমাকে যে ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে—ছাত্ররা পড়তে আসবে।

—তার আগেই আমি আপনাকে ছেড়ে দেব। খেতে দেরি করবেন না, আর কিছু ফেলেও রাখবেন না; আমি এক্ষুণি ওঘর থেকে আসছি।

বিনয় জলখাবার খেয়ে হাত ধুয়ে বসতেই তপতী পাশের ঘর থেকে ফিরে এল। সে হাল্কা প্রসাধনে নিজেকে আরও লাবণ্যময়ী করে তুলেছে। বিনয় তপতীর সঙ্গে পথে বের হ'ল। সে একবারও জিজ্ঞাসা করলে পারল না—তপতী তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা পুব পাড়ার কালী-তলায় পৌছুল। তপতী দাঁড়িয়ে বলল—একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে। ভাবনাটাকে চেপে রাখতে পারলুম না, তাই আপনাকে ডেকে এনে এমন বিরক্ত করছি।

বিনয় জবাব দিল—বিরক্ত কি আনন্দিত হচ্ছি একথা আমি বলতে চাইনা, তবে মতলবটা শোনার কৌতূহল চেপে রাখা কঠিন হচ্ছে।

—তবে শুনুন, এই জায়গাটা আমাদের অধীনে। এখানে এ পাড়ার কালীপূজা হয়। সারা বছর জায়গাটা এমনিই পড়ে থাকে। এ পাড়ায় লেখা-পড়ার তেমন চর্চা নেই। ছেলেরা একটু বড় হলেই মাছ ধরার কাজে জীবিকা নির্বাহ করে। সেই মাছের ব্যবসাও আজকাল তেমন চলে না। কেউ কেউ রোজ-গারের আশায় ধার-দেনা করে বৌ ছেলে-মেয়ে রেখে সাগরে বা আসামে মাছ ধরতে যায়। কেউ কেউ লাভবান হলেও অনেকেই

সর্বস্বান্ত হয়ে অসুখ-বিসুখ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। আমি মনে করেছি এখানে একটা সেলাই স্কুল করব। যাতে এদের মেয়ে-বৌরা বা ছেলেরা সেলাই শিখে "রেডিমেড্" পোষাকের কাজে হু'পয়সা উপার্জন করে সংসারে দিতে পারে। আমার বিশ্বাস কলকাতার উল্টোডাঙ্গা-হাতিবাগান কিংবা সন্তোষপুর-মেটিয়াবুরুজের মতো এখানেও একদিন এ ব্যবসা জমে উঠতে পারে। আর তা যদি হয় কোনদিন মাজদিয়া, গেদে, ভাজনঘাট ইত্যাদি অঞ্চলের রেডিমেড্ পোষাক বিক্রেতাদের চাহিদাও এরা মেটাতে পারবে। দূরে গিয়ে এরা কেউ শিখবে না। এদের সে চেতনা বা সামর্থ্য নেই। সেই জন্য এদের কাছাকাছি এটা করা দরকার। আমি মনে করি, সমাজে যারা পিছিয়ে আছে তাদের চেতনাকে জাগ্রত করে অভাব সম্পর্কে সচেতন করা এবং কি পুঁথিগত বিদ্যায়, কি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে আমাদের শিক্ষিত যুবক-যুবতীকেই এগিয়ে আসতে হবে। এটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, আমার বিশ্বাস—আমি এ কাজে সফল হব। আপনার কাজ হ'ল আমাকে অনুপ্রাণিত করা। আর সপ্তাহে একটি বা হু'টি দিন এসে এখানের নিরক্ষর মা-বোনেদের লেখাপড়ায় পারদর্শী করে তোলা।

তপতীর কথা শুনে বিনয় একেবারে হতবাক। তপতী বড়লোকের মেয়ে হয়েও এতবড় আদর্শের স্বপ্ন বুকে রাখে তা ভেবে সে খুব খুশি হল। সে বলল—এ তো খুব ভালো কথা, আমার স্বপ্নেরই আর এক রূপ। আপনি কাজ শুরু করুন, আমার অকৃত্রিম সহযোগিতা পাবেন।

ফেরার পথে তপতী একবার প্রশ্ন রাখল—মোটে সাড়ে চারটে বাজে, এখনই ফিরে যেতে চান কি ?

—কেন বলুন তো ?

—আপনাকে নিয়ে একবার মন্দিরে যাব ভাবছি। এত কাছে থেকেও ঠিক যাওয়া হয়ে ওঠে না—তাই ভাবছিলুম…

—চলুন যাই। আমারও অনেককাল এদিকে আসা হয়নি।

প্রায় চারদিক নদীতে ঘেরা দ্বীপ সদৃশ্য এই ভূখণ্ডে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একসময় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। আধ্যাত্মবাদী পুণ্যাত্মা মহারাজের বাসনা ছিল এই পুরীকে নব কাশী বা বাংলার কাশীক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলবেন। তাঁর আদেশে রাজ-কোষের অর্থে তাই শিবনিবাসে গড়ে উঠেছিল অগনিত শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির। কালের কুঠারাঘাতে বহুমন্দির ধ্বংস হয়ে গেলেও আজও অনেক বিগ্রহ এবং কিছু মন্দিরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান রয়েছে।

তপতীরা প্রথমে গেল শৈলেশ্বর বা বুড়োশিবের মন্দিরে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এঁর নাম রেখেছিলেন রাজরাজেশ্বর। মন্দির-অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ। এতবড় শিবলিঙ্গ পুর্ব ভারতে কোথাও নেই। বিস্ময়ে ও ভক্তিতে তপতীর মন ভরে উঠল। নির্জন মন্দিরে দু'জন ঘুরে দেখে, প্রণাম জানিয়ে তারা পাশে রাজ্ঞীশ্বর শিবের মন্দিরে এ'ল। এটি মহারাজের সাধ্বী মহিষী দ্বিতীয় রাণী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই এঁর নাম রাজ্ঞীশ্বর।

রাজ্ঞীশ্বরকে প্রণাম করে ওরা পুব পাশে রামসীতার মন্দিরে এল। শুধু রামসীতাই নয়—মন্দিরে স্থান পেয়েছে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু বিগ্রহ। যাঁরা আর্থিক দুর্বিপাকে কিংবা অন্য অসুবিধায় পড়ে গৃহে রক্ষিত বিগ্রহকে ঠিক মতো পূজা দিতে পারেন না, তাঁরা নিত্য পূজার উদ্দেশ্যে এই মন্দিরে পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্বাবধানে রেখে যান। বাড়ির বিগ্রহ ছাড়াও এখানে পথে ঘাটে, জঙ্গলে, চাষ করার সময়, নদীর জলে বিভিন্ন সময় অনেকে অনেক বিগ্রহ উদ্ধার করেছেন। সে সব এই মন্দিরে রেখেই পূজা হচ্ছে। এই ভাবেই পাওয়া গেছে সেন যুগের

একটি বিষ্ণু মূর্তি, মন্দিরের দক্ষিণ পাশে রাখা শিবলিঙ্গটি; স্ফটিক পাথরের দুর্লভ শিবলিঙ্গটিও। এটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এমন আশ্চর্য জিনিস হতে পারে। তপতী এরপর দাঁড়িয়ে আনন্দময়ীর রূপ দেখছিল। কালো পাথরের ছোট এই মূর্তিটি তার দুচোখ ও অন্তস্থল যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। প্রায় দশ মিনিট এমনি থাকার পর তপতী স্বাভাবিক হল। কৌতূহলী হয়ে ভট্টাচার্য্য মশাইকে কয়েকটি প্রশ্ন করে সে জানতে পারল, আনন্দময়ী এখানের এক বাসিন্দার গৃহদেবী। সে বাড়ির অনেকেই এখন চাকরি ইত্যাদির প্রয়োজনে দেশান্তর। নিত্য পূজায় মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটছিল। এই পরিবারের অনেকেই নাকি বিদেশ থেকে শুনেছেন স্বপ্নে আনন্দময়ী তাঁর পূজা ও ভোগ বন্ধ থাকার অভিযোগ করছেন। এমনি কয়েকবার দেখার পর তাঁরা আনন্দমীকে এই মন্দিরে রেখে গেছেন। এখানে নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে, কাজেই বিগ্রহের পক্ষ থেকে আর কোন অভিযোগ নেই।

ওরা মন্দিরের সোপান বেয়ে নিচেয় এসে দাঁড়াতেই একটি ছোট ছেলে এসে বলল—আস্সুন দিদিমণি, এই দিকে।

তপতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি কোনদিকে বলছিস রে?

ছেলেটি থতমত খেয়ে বলল—আমাদের খাবারের দোকান। জোড়া সন্দেশ, রাজভোগ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, ছানার জিলিপি যা চান, সব পাবেন।

তপতী হেসে বলল—ওহ্ তাই বল? তপতী বিনয়কে নিয়ে মিষ্টির দোকানে ঢুকল। ছানার জিলিপি ও রাজভোগ চেয়ে নিল। এই আকারের মিষ্টি এখন আর রাণাঘাট বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পদ্ম পাতায় খেতে বেশ লাগছে। পাতার এক ধরণের সুগন্ধ নাকে এসে লাগায় মিষ্টত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে।

ওরা মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটছে। পথ বেশ নির্জন। তপতী লক্ষ্য করেছে বিনয় যতই কাছে আসুক কখনও ঘনিষ্ঠ হয় না। সে যেমন স্বচ্ছন্দে বিনয়কে দেখে বিনয় কিন্তু কখনও তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে না। আজ দু'ঘণ্টার ওপর তারা কাছাকাছি পাশাপাশি থেকেছে অথচ বিনয় একটি-বারও সোজাসুজি তাকে তাকিয়ে দেখেনি। বিনয়ের এই গাম্ভীর্য তার নারীত্বকে যেন আঘাত করছে। সে অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল—বিনয়বাবু আজ আপনাকে এভাবে আটকে রেখে বোধহয় ভালো করিনি, আপনি ক্ষুন্ন হয়েছেন; সম্ভবতঃ মনে মনে আপনার রাগও হচ্ছে, তাই না?

বিনয় সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল—রাগ হচ্ছে কি ভালো লাগছে এই মুহূর্তে আমার মুখ থেকে নাইবা শুনলেন!

তপতী মনে মনে হাসল। তারপর বলল—আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলাতে কি আপনার বারণ আছে?

বিনয় জবাব দিল- বারণ যদিও নেই কিন্তু বাধা একটা আছেই, তাহলে আমার দৃষ্টি যে কোন মুহূর্তে অনুশাসনের সীমা লঙ্ঘন করতেও পারে। অতখানি স্বাধীনতা দেওয়া অনুচিৎ বলেই মনে করি।

—ওহ্ তাই বুঝি? তাহলে আমি ইতিমধ্যে অনেকখানি অন্যায় করে ফেলেছি, কি বলুন?

বিনয় হাসল। জবাবে বলল—না, মোটেই নয়। আপনার পক্ষে যা সহজ—আমার পক্ষে তা যে স্বতস্ফুর্ত হয়না সে জন্য আপনার কোন দোষ নেই, এ আমারই ত্রুটি।

তপতী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা আর বলা হল না। তারা বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। সদর দরজায়

জ্ঞানদা দাঁড়িয়ে অপর্ণার সঙ্গে কথা বলছে। সে শুধু বলল, বসে একটু চা খেয়ে যাবেন না?

বিনয় আপত্তি জানিয়ে বলল—না, আর সময় হাতে নেই, নদী পার হতেই অনেকক্ষণ সময় লাগবে, আজ চলি।

—আচ্ছা তবে আসুন, আবার আসবেন তো?

—আসব। বিনয় এবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিজের পথে প্রস্থান করল।

১৭

দিন দশেক পরের কথা। বিনয় আর এপারে আসেনি। গত কয়েকদিন হল তপতী জ্বরে শয্যাশায়ী। ইতিমধ্যে হৃদয়নাথ তাকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ এনে দিয়েছে। কিন্তু অসুখ সারছে না। সেদিন বিকাল বেলা একটুখানি ভালো বোধ হওয়ায় সে বিছানায় বসে জানালা দিয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখছিল। এমন সময় তার দৃষ্টিগোচর হল একটা বাক্স হাতে নিয়ে বিনয় এদিকে আসছে। সম্ভবতঃ ওটা ওষুধের বাক্স। বিনয় যে ডাক্তারীও শিখেছে এ কথা তপতীর জানা ছিল না। সে ভাবল, কারো কাছে সংবাদ পেয়ে হয়তো বিনয় তাকে দেখতে আসছে। তার মন পুলকে নেচে উঠল। কিন্তু বিনয় যখন এ বাড়িতে না ঢুকে সোজা রাস্তা ধরে চলে গেল তখন তার মন খারাপ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ননীকে পাঠাল। কিন্তু ননী গিয়ে তার দেখা পেল না। তখন ফিরে যাওয়ার পথে বিনয়কে ডেকে আনার জন্য ননীকে নিযুক্ত করে তপতী বালিশের উপর দেহের ভর দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেক

পরে বিনয়কে ফিরতে দেখে ননী দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনল।

বিনয় তপতীর ঘরে ঢুকে বিস্মিত হল। বলল—এ কি আপনার অসুখ দেখছি যে, কবে থেকে?

—আজ ছ'দিন হল। এত ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, দেখুন না আমার কি হয়েছে।

বিনয় একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল—আমি তো কোন পেশাগত ডাক্তার নই—তবে বিদ্যাটা শিখে রেখেছি যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগে। নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের অসুখ-বিসুখে টুকটাক চিকিৎসা করি মাত্র।

তপতী রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে জবাব দিল—আমি পর, তাই দেখবেন না এই তো?

—তা ঠিক নয়, আপনারা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ওপর ভরসা রাখতে পারবেন কিনা এই ভেবে কথাগুলো বললুম, আমার কথায় আশা করি দোষ ধরবেন না।

—আপনার ওষুধ যদি কাজ করে প্রমাণ দেখায় তাহলে ভরসা না রাখার কি আছে?

—কিন্তু সেটা তো নির্ভর করবে বিশ্বাস ও ধৈর্যের উপর।

—বিশ্বাস আছে কি নেই একবার প্রয়োগ করেই দেখুন না। কথাটা বলেই তপতী আগের ওষুধগুলো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

তপতীর কাণ্ড দেখে বিনয় আক্ষেপ করে বলল—আঃ একি করলেন? ওষুধেব এমন অমর্যাদা করা মানে ডাক্তারকেও অসম্মান করা। প্রত্যেক ডাক্তারই তাঁর সাধ্যমতো রুগীকে ভালো করার চেষ্টা করেন। এমন করা আপনাব অনুচিৎ হল।

তপতী রেগে জবাব দিল—ছাই হ'ল। ছয়-সাতদিন একটানা গিলে খাচ্ছি, কিচ্ছু হচ্ছে না, দিন দিন আমার কষ্টটাই শুধু বেড়ে যাচ্ছে...

—আর দু'একদিন খেলেই কিন্তু নিশ্চিন্ত ফল পেতেন।

—তার আর দরকার নেই, এবার আপনার ওষুধ খেয়ে দেখি কি ফল দেয়।

—আমার ওষুধ আরও নিকৃষ্টমানের। খেলে অসুখ কমার চেয়ে বাড়ারই সম্ভাবনা বেশি।

—বেশ তবে তাই-ই দিন, দেখি কতটা বাড়তে পারে। তাহলে একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকব!

—তাহলে আমার দোষ রইল না কিন্তু! বিনয় হাত বাড়িয়ে তপতীর "পালস" দেখল। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক-পিঠ ইত্যাদি পরীক্ষা করল। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদের পর বাক্স থেকে শিশি বের করে তপতীর জিভেয় দু'ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিল। আর পরের দিন সকালে খাবার জন্য একটা পুরিয়া দিযে বলল—কাল দুপুর পর্যন্ত দেখে তবে অন্য ওষুধ দেব। কেমন থাকেন কাউকে দিয়ে আমাকে কাল স্কুলে একবার খবরটা পৌঁছে দেবেন।

—একি এরই মধ্যে উঠছেন কেন? প্লীজ! আর একটু বসুন, দেখি ওষুধে কতটা কাজ হয়!

—আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ! এত তাড়াতাড়ি কি কাজ হয়? আমি আর বসব না, ছাত্ররা পড়তে আসবে।

—আচ্ছা তবে আজ আর আটকাব না। আপনার প্রচেষ্টা সার্থক হোক। কাল কিন্তু সকাল সকাল আসবেন।

—কাল বোধহয় আর আসার প্রয়োজন হবে না। তবে নিতান্তই যদি জ্বর না ছাড়ে তবে ননীকে পাঠাবেন, আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব।

না, আমি কাউকে পাঠাতে পারব না, মনে রাখবেন রুগী কেমন থাকে না থাকে নিজে এসে তার খোঁজ নেওয়া আপনার একান্ত কর্তব্য।

—আচ্ছা চেষ্টা করব। আপনি এবার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। মনে কোন উদ্বেগ রাখবেন না। দেখবেন সকল উপসর্গ কেটে যাবে, আমি চলি কেমন?

বিনয় চলে যাওয়ার খানিক পরে হৃদয় তপতীর অসুখের খোঁজ নিতে উপরে এল। তপতীর ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর ওষুধগুলো না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—তপতী, ওষুধগুলো গেল কোথায়?

তপতী পিছনদিকের বাগান দেখিয়ে বলল—ওখানে।

—তার মানে?

তপতীর নিস্পৃহ উত্তর—ফেলে দিয়েছি।

—অত দামী ওষুধ তুমি ফেলে দিলে? তোমার এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। এখন দিলকাল যা খাবাপ কিসে কি হয় তা বলা যায়? আমি তাহলে বিপিনবাবুকে 'কল' দিই, উনি এ অঞ্চলের সেরা ডাক্তার।

তপতী হেসে জবাব দিল—না হৃদয়বাবু, আপনি আমার জন্য অত দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার বিশ্বাস কালকের মধ্যে আমি ভালো হয়ে উঠব।

তপতীর কথায় হৃদয় অবাক হল। বলল—তুমি বিনা ওষুধেই ভালো হয়ে যাবে? দৈব বলে নাকি?

—ধরুন তাই। আমার অনুরোধ আজ আর আমাকে বেশি বকাবেন না। আমি সুস্থ হয়ে উঠি তারপর আপনার কৌতূহলের জবাব দেব।

হৃদয় হো হো করে একপ্রস্থ হেসে নিয়ে বলল—আমি থাকলে যদি তুমি অসুস্থ বোধ কর তাহলে আমার যাওয়াই উচিৎ। আমি যাই, তবে কাল যদি তুমি সুস্থ না হও তাহলে তোমার কোন কথাই আমি শুনব না, যত টাকা লাগুক বিপিনবাবুকে এনে তবে ছাড়ব। কথাগুলো বলতে বলতে হৃদয় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

তপতী হৃদয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটুখানি আরাম করার জন্য সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

২০

পরেরদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে তপতীর মনে হল শরীরে জ্বর নেই। তবুও থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল যে, সত্যিই জ্বর ছেড়ে গেছে।

দুপুরবেলা কিছু হাল্কা পুষ্টিকর খাবার খেয়ে তপতী নির্জন ঘরে কিছুক্ষণ জানালায় চোখ পেতে রাখল। তারপর শেলফ্ থেকে বহুদিনের পুরানো কলেজ ম্যাগাজিনখানা বের করে পড়ায় মন দিল। কত বছর আগে বিনয় এই প্রবন্ধটা লিখেছিল। কলেজ জীবনে এমন বড় বড় কথা অনেকেই বলে বা লেখে। পরবর্তী জীবনে আবার সে সব যথারীতি ভুলে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথে এগোয়। কিন্তু বিনয় তা করেনি। দৃঢ় পদক্ষেপে সে আদর্শের পথে এগিয়ে চলেছে। বিনয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় তপতীর মন ভরে উঠল। তারপর অধীর আগ্রহে সে তার পথ চেয়ে অপেক্ষায় রইল।

দুপুরের পর তপতী যেই মাত্র একটু বিছানায় পাশ দিয়েছে অমনি জ্ঞানদা এসে খবর দিল—বিনয়বাবু এসেছে, নিচের ঘরে বসেছে।

তপতী তাড়তাড়ি আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল—ওকে তুমি ওপরে পাঠিয়ে দাও।

বিনয় তপতীর ঘরে পা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আজ কেমন আছেন?

তপতী মুখখানা কাচুমাচু করে জবাব দিল—মোটেই ভাল নেই, বোধহয় জ্বরটা বেড়েছে।

বিনয় বিস্মিত হয়ে বলল—তাই নাকি? তাহলে তো আমার "ডায়াগনসিস" ঠিক হয়নি, 'পাল্‌স'টা দেখি।

তপতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তার সুডৌল বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিলে বিনয় কয়েক সেকেণ্ড পরীক্ষা করে বলে উঠল—কই কোন জ্বরের লক্ষণ পাচ্ছিনা তো, ওষুধটায় তাহলে কাজ হয়েছে।

—সেটা আপনাব ওষুধ আপনিই ভালো জানেন। বারবার আসার ভয়ে আপনি এমন বাজে ওষুধ দিয়ে যাবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিনয় মৃদু হেসে জবাব দিল—সেটা আমি কেন, চিকিৎসক মাত্রেরই এই কামনা, যাতে রুগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে, কষ্ট থেকে অব্যাহতি পায়। তবেই তো শুধু চিকিৎসক নিজে নয়, সেই শাস্ত্রেরও গৌরবের কথা!

তপতী হেসে বলল—গতকাল বললেন ডাক্তারী আপনার পেশা নয়, কিন্তু আমি ওষুধ খেয়ে বুঝতে পারছি আপনি হাতুরে ডাক্তার নন। খুব সম্ভবতঃ আপনি এ শাস্ত্রে ভালোমতো জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। সত্যি কিনা বলুন? আপনি এখানে ডিস্পেন্সারী করছেন না কেন?

বিনয় জবাব দিল—আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। আমার এক পুলিস বন্ধুর অনুপ্রেরণায় এ বিদ্যেটা আয়ত্ত করেছি। তবে পেশার জন্য নয়, যাতে প্রয়োজনে মানুষকে সেবা করতে পারি এই উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশের ভাইবোন বা তাদের মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, পিসিমার অনেকেই আজও একখানা চিঠি লেখার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী থাকেন। তাঁদের জন্যই

আমার প্রয়াস। এঁদের প্রয়োজনে আমার এ বিদ্যেটাও যাতে কাজে লাগে এই উদ্দেশ্যেই হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারীটা শিখেছি। কারণ, এটা আমার আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে ছিল। তাছাড়া আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই ইচ্ছা থাকলেও এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসার করানোর ক্ষমতা নেই—তাদের পক্ষে বাধ্য হয়েই বিকল্প কিছু ভাবতে হয়। সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিই অধিক উপযোগী।

—তা হোক, কিন্তু দেশে এত ভালো স্থান থাকতে আপনি এই গ্রামকেই বেছে নিলেন কেন?

আমার দৃষ্টিতে এটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কারণ, এখানেই একদিন আমার স্বর্গতা মা তাঁর ভাবী সন্তান অর্থাৎ আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাছাড়া শহরের মানুষের শিক্ষা নেবার অনেক সুযোগ আছে এবং তারা সচেতনও। কিন্তু গ্রামে সে পরিবেশ নেই। আমার মতে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে কিছু শিক্ষিত যুবক-যুবতীর প্রত্যেকে যদি অন্তত পক্ষে দশজন করেও মানুষকে স্বাক্ষরের আওতায় আনে তাহলে একসময় দেখা যাবে আমাদের দেশে নিরক্ষর বলতে আর কেউ নেই।

তপতী মুগ্ধ হয়ে বিনয়ের কথাগুলো শুনছে। একসময় সে বলে উঠল—আপনার কথা ও কাজকে মনে-প্রাণে আমি শ্রদ্ধা করি। মাঝে মাঝে নিজেও কিছু পরিকল্পনা করি কিন্তু নিজেকে বড় অসহায় মনে করে এগুতে সাহস হয় না। নারী হয়ে জন্মেছি, আমার পশ্চাতে সাহায্যকারী হিসাবে দাঁড়ানোর কেউ নেই। তাই ইচ্ছা থাকলেও অনেক কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারিনা।

বিনয় উত্তর দিল—আপনি নিজেকে পরাধীন বা অসহায় ভাবেন এটা ঠিক নয়। আজ সমাজে নারীরা আর পরাধীন নেই।

তারাও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করছে, তা কী সামাজিক, কী রাজনৈতিক, সকল ক্ষেত্রেই।

তপতী প্রতিবাদ করে বলল—না বিনয়বাবু, এটা আপনি ভুল বলছেন। সমাজে নারীরা কোথাও কোনদিন স্বাধীনতা পায়নি, পাবেও না। তাদেরকে চিরদিনই পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। পুরুষরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্বাধীনতা দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে। আজ যে স্বাধীনতা তারা ভোগ করছে বলে দাবী করে—তা কোন কোন পুরুষের উদারতার গুণে। আমরা মুখে অনেক কিছু বললেও একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় পুরুষের প্রাধান্য তার জন্ম বা প্রকৃতিগত। নারী বিধাতার কাছ থেকেই পুরুষের সম অধিকার থেকে বঞ্চিতা। এর বড় প্রমাণ ভারতীয় নারীদের বিয়ের ক্ষেত্রে। তারা যতই সুন্দরী আর রূপের অধিকারিণী হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ পুরুষ তাকে পছন্দ না করছে ততক্ষণ তার সেই সৌন্দর্য্য, গুণ বা অন্তর্নিহিত ভালোবাসার কোন মূল্যই নেই—বলুন ঠিক কিনা?

বিনয় একটু চুপ করে থেকে বলল—আপনার শরীর ভালো নেই, আজ আপনাকে তর্কের মধ্যে টেনে এনে আর উত্তেজিত করে কষ্ট দিতে চাই না, এই প্রসঙ্গে অন্য একদিন আলোচনা করা যাবে।

তপতী প্রতিবাদ করে বলল—আজ আমি যথেষ্ট সুস্থ আছি। আমি বিশ্বাস করি, এমন গল্প করায় আমার কোনই ক্ষতি হবে না। মন খুলে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে অসুস্থ শরীর-মন ভালো হয়ে ওঠে এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। হাসপাতালে "ভিজিটিং আওয়ার" নির্ধারিত হয়েছে শুধু অসুস্থ রুগীর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য নয়, প্রিয়জন গিয়ে কথা বলে তাকে মানসিক শান্তি দেবে—এইজন্যও।

বিনয় বলল—তাহলে শুনুন, এই ভারতবর্ষেই পুরাকালে স্বয়ম্বর সভা হত। সেখানে মেয়েরাই পছন্দ মতো স্বামী নির্বাচন করত, পুরুষের ইচ্ছা থাকলেও তার মনের মতো নারীকে সে বিয়ের সুযোগ পেত না।

—দেখুন সে একটা বিশেষ যুগে, ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। কিন্তু তার আগে বা পরে নারীরা শুধু পুরুষের ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার উদাহরণ দিতে গেলে খাতার পৃষ্ঠায় কুলাবে না। ইতিহাসে যেমন এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে, বর্তমান সভ্য সমাজেও এ ঘটনার কিছু কমতি নেই, দৈনিক পত্রিকাগুলি এর যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ দেবে।

বিনয় তপতীকে আর বিতর্কে না জড়িয়ে বলল—আচ্ছা অন্যদিন কথা বলব, আজ আমি উঠি, আমার একটু তাড়া আছে।

—তাহলে কাল আর একটু সকাল করে আসবেন।

—কাল বোধহয় আসতে পারছি না। কাল আমাকে আড়ংঘাটা যেতে হবে, পিসিমা খবর পাঠিয়েছেন।

—যদি পিসিমার বাড়িতে যান তবে কিছু বলছি না, না হলে কিন্তু আপনার আসা চাই-ই, আমি পথ চেয়ে অপেক্ষা করব।

কথাটা বিনয়ের শ্রবণ ইন্দ্রিয় পথে প্রবেশ করে তার হৃদয়ের মর্মস্থলে পৌঁছাল। সে তপতীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর মৃদু হেসে বলল—আপনার অসুখ তো ভালো হয়ে গেছে। আপাতত আর হবারও লক্ষণ দেখছি না, শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত করতে ··

—কি বলছেন, আপনি এলে আমি বিব্রত হই? বিব্রত বা বিরক্ত করার লোক আপনি? আপনি অবশ্যই আসবেন। আমার অসুখ সম্পূর্ণ সারেনি, ভেতরে ভেতরে এখনও কিছুটা রয়ে গেছে। আপনি না এলে তা বেড়ে যেতেও পারে। আপনি

ডাক্তার হতে পারেন—কিন্তু জ্যোতিষীদের মতো ভবিষ্যৎ বক্তা নন। আর হলেও আমি তা স্বীকার করে নেব না। অতএব যতদিন আমি সম্পূর্ণরূপে ভালো না হচ্ছি ততদিন রোজ না হোক অন্তত এক-দু'দিন ছাড়া ছাড়া আপনার আসা চাই-ই।

বিনয় হেসে জবাব দিল—আচ্ছা চেষ্টা করব।

—চেষ্টা নয় আসবেন বলুন?

—আচ্ছা আসব।

—আর আমার সেলাই স্কুলের ব্যাপারে কি হবে?

—আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর আলোচনা করব, আজ আসি।

—আচ্ছা আসুন তবে।

বিনয় চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর দয়াময়বাবু এসে তপতীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মাগো আজ কেমন আছ?

—আসুন কাকাবাবু, আমি ভালো আছি। ডাক্তারবাবু কাল অন্ন পথ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।

দয়াময়বাবু চেয়ারে বসে বললেন—যাক্ মঙ্গলময় আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার জন্য এক'দিন আমরা যে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি সে আর কি বলব! তোমার কাকীমার তো অন্নজল ত্যাগ করার দশা—রাতদিন আমাকে অনুযোগ করে বলছে—"ওগো তোমরা মেয়েটার দিকে একটু নজর দাও, ভালোমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।" আজ আসার জন্য সে কি পীড়াপিড়ি, কিন্তু আনতে পারলাম না—জানোই তো ঘরে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে, কখন কি হয় বলা তো যায় না, তাই একরকম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে এলাম।

দয়াময়বাবুর কথায় হাসি পেলেও তপতী তা সামলে নিয়ে বলল—আজ গিয়ে খবর দেবেন আমি ভালো আছি, সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। উনি যেন আমার জন্য শুধু শুধু দুশ্চিন্তা না করেন।

দয়ামনবাবু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—যাক্ মা তুমি বিশ্রাম কর, আমি এখন আসি। নিচেয় হৃদয় অপেক্ষা করছে, আমি থাকায় সে বোধহয় আসতে পারছে না। তোমার অসুখের জন্য বাবাজী আমার একেবারে ভেঙে পড়েছে। সব সময় তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

কথাগুলো শেষ করে দয়ামনবাবু বেরিয়ে যেতেই তপতী মনে মনে বিরক্ত হল। ভাবতে লাগল, হৃদয় আবার কতক্ষণ তাকে আটকে রাখবে কে জানে!

তার চিন্তার অবকাশ না দিয়ে হৃদয়নাথ ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর এক ঠোঙা আপেল ও বেদানা রেখে জিজ্ঞাসা করল—আজ কেমন আছ?

তপতী জানালার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ছোট্ট জবাব দিল—ভালো।

—"পাল্‌স" দেখি।

হৃদয়নাথ এমনভাবে হাত এগিয়ে দিল যেন সে একজন নামকরা ডাক্তার।

তপতী পাল্‌স দেখানোর কোন লক্ষণ না দেখিয়ে বলল, আর দেখার প্রয়োজন নেই আমি বেশ সুস্থ আছি।

—সে আমি জানি তুমি সুস্থ আছ, নইলে ঘন্টার পর ঘণ্টা কারো সাথে অমন মজে থাকতে পারতে?

—তার মানে?

—মানে তুমি ভালোমতোই জানো। আমরা কত টাকা-পয়সা খরচ করে তোমাকে সুস্থ করে তুলছি —আর তুমি একজনকে খুশি করার জন্য আমাদেরকে অপমান করছ!

—আপনাদের আবার কি করে অপমান করা হল?

—কি করে নয়? তুমি ওষুধগুলো ফেলে দিলে কেন? ওই ওষুধেই তো তোমার অসুখ সেরেছে।

—মোটেই না। তাহলে ওষুধ ফেলে দেব তেমন অমানুষ আমি নই।

—তবে কি তোমার অসুখ ওই বিনয়বাবুর পুরিয়া খেয়ে ভালো হয়েছে? ডাক্তারির 'ড' জানেনা সে আবার ডাক্তারী ফলাতে এসেছে!

—হৃদয়বাবু, আপনার মুখে মদের গন্ধ। ওই সব বাজে জিনিস খেয়ে এখানে এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না। আপনার বাবা এই মাত্র বলে গেলেন আমার জন্য নাকি দুশ্চিন্তায় আপনার ঘুম হচ্ছে না—এই কি তার নমুনা?

—কথা বললেই মাতলামি করা হল, না? মদ কারো বাপের পয়সায় খাইনি; আজকাল সব ভদ্রলোকই খায়।

কে কি করে—না করে আমার দেখার দরকার নেই। আমার অনুরোধ, এসব খেয়ে আমার বাড়িতে ঢুকবেন না। আমার মাথা ঘুরছে, আপনি এখন আসুন।

—কেন? আমি কি জোর করে তোমার গায়ে হাত দিয়েছি? না কখনো মন্দ প্রস্তাব করেছি? অতখানি নীচ আমি এখনও হইনি।

এই সময় জ্ঞানদা এসে বলল—বাপু আজ আর কথা বাড়িয়োনা, ওকে চুপ করে শুয়ে বিশ্রাম করতে দাও।

—আচ্ছা ঠিক আছে, দেখব কে কত সাধু!

হৃদয় বেরিয়ে গেলে তপতী জ্ঞানদার কোলে মুখ গুজে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার কান্নার হেতু যত না হৃদয়ের আচরণকে দায়ী করে, তার বেশি এমন নির্জন জায়গায় অভিভাবকহীন রেখে তার বাবার অসময়ে মৃত্যুর কারণে। জ্ঞানদা যথাসাধ্য তাকে প্রবোধ দিতে থাকে।

২১

দিন তিনেক পরের কথা। সকালবেলা তপতী সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে তপন অপর্ণা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। তার হাতে ব্রিটানিয়া কোম্পানীর এক প্যাকেট বিস্কুট। সে তপতীকে প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল—চায়ের সঙ্গে খেয়ো, বাবা তোমার জন্য এনেছে।

অপর্ণার বাবা শিয়ালদায় এক বড় ষ্টেশনারী দোকানে কাজ করেন। মাসে এক-দু'বার বাড়িতে আসেন। গত সপ্তাহে যখন এসেছিলেন, তপতীর জ্বর দেখে গিয়েছিলেন। তাই বাড়ি আসার সময় তপতীর জন্য বিস্কুট নিয়ে এসেছেন।

তপতী প্যাকেটা হাতে নিয়ে বলল—দূর পাগলী এটা আবার আনতে গেলি কেন? আমি তো চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

চা না হয় এমনিই খেয়ো।

খানিক বাদে তপতীর কথামতো জ্ঞানদা চা দিয়ে গেলে বিস্কুটের সঙ্গে চা খেতে খেতে তপতী জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে এবারের ছেলেটাকে কেমন দেখলি?

অপর্ণা কিছুক্ষণ অধোবদনে থেকে তপতীর দিকে বার দুই তাকাল। তার মুখে কোন কথা ফুটল না।

তপতী তাকে ভাবার অবকাশ দিয়ে বলল—আমার কিন্তু ছেলেটাকে ভালোই লেগেছে। চেহারায় বা বেশভূষায় বেশ নম্র-ভদ্র মনে হয়েছে।

—হ্যাঁ।

অপর্ণার ছোট্ট একটু জবাবে তপতী বুঝে নিল ওর পছন্দ হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল—ছেলেটি কি করে না করে জেনেছিস কিছু?

—শুনেছি চাকদার বাজারে ওর বড়দার কাপড়ের দোকান আছে। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কোন চাকরি না পেয়ে দাদার দোকানেই বসছে। দাদা ভাইকে বিয়ে দিতে চায়।

—তবে তো ভালো কথা। দাদা নিশ্চয়ই ভাইএর ভবিষ্যৎ ভেবেছেন। আজকাল চাকরির পিছনে মিথ্যে দৌড়াদৌড়ি না করে যা হোক কিছু করা ভালো। ব্যবসা তো আরো বড় কথা। এখানে ঝুঁকি আছে ঠিকই—তবে নিষ্ঠা সহকারে লেগে থাকলে অনেক উন্নতি করা যায়। চাকরিতে গোনা পয়সা, কিন্তু ব্যবসায়ে অনেক বেশি রোজগার করা যায়। আমার বাবার কথাই ধর—চাকরি করলে তিনি কত টাকা জমাতে পারতেন? এবার বল ওখানে তোর মত আছে কিনা?

অপর্ণা কোন জবাব দিল না দেখে তপতী তাকে কোলে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বলল—আমি একদিকে দিদি, অন্যদিকে সই, আমার কাছে বলতে তোর লজ্জা কিসের?

অপর্ণা তপতীর কাঁধের উপর চিবুক রেখে বলল—আমার বাবা যে গরীব, ওরা যদি বেশি কিছু চায় তাহলে তো আমার মতামতের কোন মূল্যই থাকবে না…

—যাক্ আমি নিশ্চিন্ত হলুম। ওরা যে কিছু দাবী করবে না এটা হতেই পারে না। সব ছেলেরই বিয়ে করার সখ, কিন্তু চাই সুন্দরী বউ এবং ভালো দেনাপাওনা—তা মেয়ের বাবার দেওয়ার ক্ষমতা থাক বা না থাক। ঠিক আছে দেনা-পাওনা নিয়ে আমি কথা বলব। তুই একটু বস, আমি শাড়ীটা পাল্টে নিই, চল তোদের বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসি।

—সত্যি তুমি যাবে?

—বারে আমি কি মিথ্যে বলছি? বললুমতো শাড়ী পাল্টে তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

তপতী অপর্ণাদের বাড়ি গিয়ে দেখল, ওর বাবা বনমালী

কুণ্ডু বাঁশ ফেড়ে চটা তৈরি করছেন। গোরুর জন্য গোড়া বানাবেন। তপতীকে দেখে দা ফেলে রেখে এগিয়ে এসে বললেন—এসো মা, তোমার শরীর ভালো তো?

—হ্যাঁ কাকাবাবু ভালো আছি। পরশুদিন ভাত খেয়েছি। একটা বিষয়ে আলোচনা করতে এলুম।

—তা মা কষ্ট করে না এসে খবর পাঠালেই তো হত!

—এটুকু আসতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। তাছাড়া বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

বীণাদেবী অপর্ণাকে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে কি বলতে তপতী তা শুনতে পেয়ে বলে উঠল—কাকীমা ওসব লৌকিকতা রাখুন, ওসব ঝামেলা করলে এক্ষুনি পালাচ্ছি।

বনমালীবাবু বললেন—যাক্ মাকে তাভিয়ে লাভ নেই। ঘরে যা আছে তাই দাও। দুধ গরম কর।

—না কাকাবাবু আমি দুধও খাব না, দরকারী কথাটা সেরেই চলে যাব।

তবে মা কি হলে তোমাকে বেশিক্ষণ রাখা যাবে?

তপতী হেসে বলল—আজ নয়, অপর্ণার বিয়ের দিন একনাগাড়ে দিন-রাত থাকব।

—সে আর হচ্ছে কই মা! যারা আসছে মেয়ে দেখে পছন্দ করছে। কিন্তু ফিরে গিয়ে এমন সব ফিরিস্তি দিচ্ছে যে, আমার পক্ষে আর সেদিকে মাড়ানো সাধ্যে কুলাচ্ছে না।

—চাক্‌দার ছেলেটার খবর কি?

—ওই একই ব্যাপার মা। ভেবেছিলাম ছেলে চাকরি-বাকরি করেনা, এখানে কম-সমে কাজ করা যাবে। কিন্তু কাল কলকাতা থেকে ফেরার পথে একবার ওখানে নেমে ছেলের মায়ের যে দাবী শুনলাম—তাতে তো আমি কূলকিনারা দেখছিনা!

—ওরা কি চায় কাকাবাবু?

—ওরা সোনা, সাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি তো চায়ই, তারসঙ্গে

ওদের বাড়ির [illegible] বাবদ পাঁচহাজার টাকা চায়। ওদের [illegible] ছেলের বিয়ে, ওরা নিমন্ত্রণ করে লোক খাইয়ে কত জিনিসপত্র লুটবে অথচ ঘাড় ভাঙবে এই মেয়ের বাবার—কি আর বলি বল?

—সে আর কি করা যাবে কাকাবাবু, এইতো এখনকার প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার আইন করেছে, কিন্তু কে আর মানছে বলুন। পাঁচহাজার তো খুবই সামান্য দাবী। আর যা চাইছে তাকি আপনাদের জোগাড় হচ্ছে?

—জোগাড় আর কোথা থেকে করি মা! করিতো পরের দোকানে ফর্দ্দ লেখার কাজ। দোকানেই থাকি বলে ঘর ভাড়া, খাওয়া খরচটা লাগেনা; তাই কোনমতে তোমার কাকীমার হাতে কিছু সংসার খরচ দিতে পারি। তোমার কাকীমাই গরুটা পুষে খুকীর জন্য টুকটাক কিছু কিছু করে রেখেছে। সাইকেলটাও না হয় বাঁশ বেচে জোগাড় করব। কিন্তু ঘড়ি আংটি আর নগদ পাঁচ হাজারতো কিছুতেই সম্ভব নয়।

তপতী বলল—কাকাবাবু, আগামীকাল কোলকাতা যাবার পথে আপনি একবার চাক্‌দা নামুন। দেখুন কিছু কমানো যায় কিনা। যদি কম হয় ভালো কথা—না হলে ওতেই রাজী হয়ে বিয়ের কথা পাকা করে আসবেন।

—মা, তুমি কি বলছ আমি তো ঠিক বুঝতে পারছিনা। আমার [illegible] সঙ্গতি কোথায় যে রাজী হব?

—আমি ভরসা দিচ্ছি সব জোগাড় হয়ে যাবে, আপনি কথা দিয়ে আসুন। বলবেন সব জিনিষের সঙ্গে নগদ টাকাও বিয়ের রাত্রে পাওয়া যাবে। সব বুঝে নিয়ে তবেই ছেলে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে।

—আচ্ছা মা আচ্ছা। তুমি খুকীর জন্য যতখানি করছে তা আমি ভাবতে পারিনি।

—কাকাবাবু, ও আমার একটা ছোট বোন, এটুকু করা আমার কর্তব্যের সামান্য অংশ মাত্র। তাছাড়া মনে করবেন এ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

—বেঁচে থাকো মা, চিরসুখী হও।

—কাকাবাবু কলকাতা পৌঁছেই আমাকে চিঠি দিয়ে সব কথা জানাবেন কিন্তু।

—আচ্ছা মা, আচ্ছা।

তপতী আর কিছুক্ষণ বসে কিছু কথাবার্তা কয়ে বিদায় নিল।

২২

গত তিনদিন তপতী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে, কিন্তু বিনয় আসেনি। আজ ধৈর্য্যহারা হয়ে সে বিকালের দিকে ননীগোপালকে সঙ্গে নিযে নদী পার হয়ে বিনয়ের গৃহ-আশ্রমে উপস্থিত হল।

বিনয় বারান্দায় মাদুর পেতে বসে মহেশকে পড়াচ্ছে। পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তপতীদের দেখে সে বলে উঠল—আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য!

তপতী প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিল—দেখুন ওভাবে আমাকে বলা আপনার মোটেই শোভা পায় না। কারণ, আপনি আমাকে ডেকে আনেননি—আর আসতেও বলেননি।

—সত্যিই আমি দুঃখিত। এখানে আপনাকে উপযুক্ত আপ্যায়ণ করা সম্ভব নয় ভেবেই আসতে বলতে পারিনা।

—ওহ্, [illegible]মি বুঝি গ্রামবাংলার মেয়ে নই? আমাকে বুঝি মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে হয় না।

—তাহলেও…

—তাহলে কী? বলুন। বুঝেছি, আপনি বলতে চাইছেন আমি বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে আসতে চাইব না এইতো? ভাগ্যক্রমে আমরা যে যেখানে জন্মেছি সেটাই আমাদের বড় পরিচয় নয় বিনয়বাবু! পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তির প্রভাবে নিজেকে বড়লোক বা ধনী ব্যক্তি প্রতিপন্ন করে অন্যকে অবহেলা দেখানোর সুযোগ আর নেই। কারণ, সে দেশে সম্পদের মালিক ব্যক্তিবিশেষ নয়, রাষ্ট্র। তেমন কোন দেশে জন্মালে আমার প্রতি এমন অনাবশ্যক সমীহভাব না দেখিয়ে সহজেই কাছের জন বলে মনে করতেন।

বিনয় জবাব দিল—আমাদের দেশ যতদিন তেমন না হয়ে উঠছে ততদিন তো বর্তমান দেশাচার মানতেই হবে!

—সে আর কি করে হচ্ছে বিনয়বাবু, আমরা যে মনে-প্রাণে তেমন চাইনা। আমরা পাবার ব্যাপারে অর্থাৎ দাবীর বেলায় যত সোচ্চার হই—কিন্তু দেবার বেলায় অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পদ হস্তান্তর করে অন্যকে বা রাষ্ট্রকে দেবার প্রশ্নে মোটেই উৎসাহী নই। এতো গেল অনেক দূরের কথা। আমাদের দেশে এমন অনেক রাজনৈতিক কর্ণধার আছেন যাঁরা তাঁদের উদার তন্ত্র বা মতবাদ প্রচার করে সাধারণকে শিক্ষা দিতে চান অথচ তাঁরাই নানা পন্থা অবলম্বন করে প্রাপ্য রাজস্ব থেকে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করতে দ্বিধা করেন না।

বিনয় তপতীর কথাটাকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল—আপনার এই বক্তব্যের শেষাংশ না হয় ধরছি না; প্রথম অংশ কি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

তপতী সাহসের সঙ্গে উত্তর দিল—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

আমার থাকা-খাওয়া, জীবনের নিরাপত্তা, এবং সুরক্ষার বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নয়—সে আমার যত আপনজনই হোক। ভালো কথা, আমাদের রাণাঘাটের বাড়িতে দুটো আলমারী ভর্তি বই আছে। এরমধ্যে, প্রথম থেকে শেষ, আমার বহু পাঠ্য বইও আছে। আমার ইচ্ছা ওগুলো আপনার এখানে রাখি—যাতে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। নাহলে ওগুলো অযত্নে নষ্ট হয়ে যাবে।

—কিন্তু কি? ওহ্ বুঝেছি, আপনি ভাবছেন আমার এত আগ্রহ কেন এবং স্বার্থই বা কিসের, এইতো? দেখুন বিনয়বাবু, সমাজে অনেকেই স্বার্থবাদী ঠিকই কিন্তু সকলের স্বার্থের প্রকৃতি এক নয়। আপনি জানেন আমার কিছু অর্থ আছে। ইতিপূর্বে বলেছি সে অর্থ আমি কোন ব্যক্তিকে দিতে চাইনা। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কথা। আমি জানি আপনার হাতে গেলে তা ব্যক্তিগত সুখভোগে ব্যয়িত না হয়ে বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। সেই জন্যই আমিও বলি—আপনার সাধনার পথে অগ্রসর হতে গিয়ে যদি অর্থের প্রয়োজন হয় আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে বলবেন—এটা আমার একান্ত অনুরোধও বটে। আসলে কি জানেন—আপনার যা আদর্শ, আমার তা স্বপ্ন। আপনি যা প্রত্যয় দিয়ে গড়েন, আমি তা কল্পনা দিয়ে ছবি আঁকি। কিন্তু আমার একার সাহস নেই কিছু করি। কারণ, আমার পেছনে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। যারা আছে তারা শুধু ব্যক্তিগত ভোগ-লালসাই চরিতার্থ করতে চায়!

বিনয় হেসে জবাব দিল—ব্যক্তিগত ভোগ-লালসা কার নেই? সে তো আমারও আছে।

তপতী তাকিয়ে দেখল মহেশ আর ননী কুলতলা গিয়ে

কুল পাড়ায় ব্যস্ত রয়েছে। তপতী নিশ্চিন্ত হয়ে বিনয়ের চোখে চোখ রেখে বলল—আপনার ভোগ-লালসার পরিধি আমার জানা আছে, এবং এও জানি তা আপনি কোনদিনই মুখ ফুটে কাউকে জানাবেন না, তাই তাগিদ অনুপাতে অন্য পক্ষকেই হয়তো একদিন উদ্যোগ নিতে হবে। কথাটা উচ্চারণ করেই সে মুখ নত করে মুখে আঁচল চাপা দিল।

সহসা কে যেন বিনয়ের দুই কানে গরম সীসে ঢেলে দিয়েছে। উষ্ণতায় সে বধির হবার উপক্রম। তার সকল শিরায় যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলা করছে। সে প্রবল ধৈর্য্য অবলম্বন করে অনিমেশ পলকে নতমুখী রক্তিম তপতীকে দেখতে থাকে।

এই সময় ননী ও মহেশ একরাশ পাকা কুল এনে মাদুরের উপর রাখতেই তপতী ছেলেমানুষের মতো টপাটপ মুখে পুরতে লাগল। তা দেখে বিনয় বলে উঠল—দাঁড়ান, এভাবে খাবেন না, দাঁত টকে যাবে, আমি নুন এনে দিচ্ছি।

বিনয় উঠে গিয়ে ঘর থেকে নুন এনে দিল। কিন্তু সে নুন কোন কাজে লাগল না। তপতী হঠাৎ বলে উঠল—এমাঃ কি করলুম!

বিনয় প্রশ্ন করল—কেন, কি হল?

—আমি তো কুল খাই না।

বিনয় হেসে বলল—ওঃ বুঝেছি! ঠিক আছে, গলার স্বর নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকলে না খাওয়াই ভালো। তাহলে শুধু আপনার নয়; শ্রোতাদেরও অনেক লোকসান হয়ে যাবে।

তপতী জবাব দিল—আমি তেমন বড় কোন গাইয়ে নই যে, শ্রোতাদের কোন লোকসান হবে। আমার গান আমি করি, আমিই শুনি।

বিনয় জবাব দিল—আর সৌভাগ্য হলে আমরাও শুনতে পাব, কি বলুন?

—তাতে সৌভাগ্যের কিছু নেই–বরং ভাববেন সেটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

—বেশ, তবে যেচে সেই দুর্ভাগ্যেরই নিমন্ত্রণ নিচ্ছি।

—আপনাকে যেচে নিতে হবে না, কাল বিকালে আমার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ রইল, যাবেন তো?

—ঠিক আছে গ্রহণ করলুম।

— তাহলে আজ উঠি?

—উঠবেন? কি করে বাধা দেব বলুন?

—না, এখন আর বাধা নয়, এ ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক্। তপতী উঠল।

সকলে পথে নামল। খেয়া ঘাটে এসে তপতী আর ননী নৌকায় উঠল। খেয়া নৌকা তপতীকে নিয়ে একটু একটু করে ওপারের দিকে সরে যাচ্ছে। বেলা ডুবে গেছে। আস্তে আস্তে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নামছে। পশ্চিম আকাশে গোধূলি রঙের আল্পনা। সে রঙের বিচ্ছুরণ এসে বিনয়ের মনকেও রাঙিয়ে তুলছে। তার গল্পে, উপন্যাসে অনেক নারী চরিত্র সে এঁকেছে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ কোন নারী সম্পর্কে ভাববার অবকাশ তার ঘটেনি। কলেজ জীবনের যে সব মুহূর্তে তপতীর সান্নিধ্য ঘটেছে, তা ছিল নিতান্তই তাৎক্ষণিক; কখনো ভাবনায় রূপ পায়নি। কিন্তু আজ তপতীকে বিদায় দিয়ে তার বড়ই অস্বস্তি লাগছে। যেন এক কঠিন একাকীত্ব তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘিরে ধরছে। সে জানে না কিসে এর থেকে মুক্তি। যা জানে তা বড়ই অবাস্তব কল্পনা। সে এক মধুর জ্বালাময় দহন বুকে নিয়ে বাড়ির পথে চলল।

২৩

গভীর রাত্রি। তপতী ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের দেশে বিচরণ করছে। উঁচু পাহাড়ের গা থেকে এক ঝর্ণার উৎপত্তি হয়েছে। তার উপরে শিব মন্দির। তপতী ঝর্ণার জলে স্নান সেরে ফুলের সাজি নিয়ে মন্দিরে ঢুকে অপরূপ শিব মূর্তিকে পূজা করল। কিছুক্ষণ পরে সেই মূর্তির রূপ বদলে হ'ল রাজরাজেশ্বর শিবলিঙ্গ। পরক্ষণে তার রূপ পাল্টে এক মানব দেবতা হয়ে তপতীর সামনে দাঁড়াল। বলা বাহুল্য—সে এই বিনয়। তপতীর ঘুম ভেঙে গেছে। সে বিছানায় উঠে বসে তন্ময় হয়ে ভাবছে। তারপর নিজের শয্যায় বিনয়ের উপস্থিতি কল্পনা করে সে গভীর আবেগে পাশ বালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাত্রে আবার তপতীর নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল। তার স্মরণ হ'ল—আজ ভৈমী একাদশী। সে শয্যা ত্যাগ করে জ্ঞানদা ও ননীকে ডেকে তুলল। তারপর পূজার উপকরণ গুছিয়ে নিয়ে তিনজনে রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে গেল। তখনও সকাল হয়নি। এর মধ্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মশাই স্তোত্র পাঠ করছেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের উচ্চারিত সংস্কৃত মন্ত্র কর্ণকুহরে প্রবেশ করে হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হচ্ছে। তপতী সিঁড়ি ভেঙে উপরে গিয়ে পূজার সামগ্রী পৌঁছে দিল। তারপর একপাশে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে মুদ্রিত নয়নে উচ্চারণ করল :—

প্রভুমী শমনী শমশেষগুণং, গুনহীনমহীশ গরলাভরণম্।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং, প্রনমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
গিরিরাজ সুতন্বিত বামতরুং, তনু নিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণু শিরোধৃতপাদযুগম্, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

* * * * *

জগদুদ্ভব পালননাশকরং, করুণৈব পুনস্ত্রয় রূপধরম্।
প্রিয় মানব সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
নদত্তং পুষ্পং সদা পাপচিত্তৈঃ, পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখ সমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

পূজা শেষ হলে তপতী নিচে এসে অবাক হয়ে দেখল, বিনয় দাঁড়িয়ে আছে। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল—আজ আমার পূজা সার্থক।

বিনয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—তার মানে ?

—মানে এখানে নয়, বাড়ি গিয়ে বলব। এখন আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ ?

—চলুন বলছি। তপতী জ্ঞানদা ও ননীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বিনয়কে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। অবশেষে রাজরাজেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল—আমাকে ছুঁয়ে তুমি প্রণাম ক'র।

হঠাৎ তুমি সম্বধনে বিনয় আশ্চর্য হলেও মুখে কিছু না বলে তপতীর আজ্ঞা পালন করল।

তপতী নিচেয় এসে বলল—আজ তো স্কুল ছুটি, এখন তোমার কোন জরুরী কাজ নেই তো ?

বিনয় জিজ্ঞাসা করল—কেন বলুন তো ?

তপতী চোখ পাকিয়ে বিনয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—উঁহু কথা ঠিক করে বল, আর "আপনি" নয়।

বিনয় হেসে বলল—বেশ বলছি, তোমার মতলব কী ?

—তোমার তো আজ বিকালে আসার কথা ছিলই, ভাবছি এখন তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।

—তারপর ?

—বাড়ি গিয়ে ভাবব—কি করা যায়। সেলাই মেসিন কেনার প্রোগ্রামটা আজ তৈরি করে ফেলব।

বিনয় আর কথা না বাড়িয়ে তপতীর পিছনে হাঁটতে লাগল। তার শিরায় শিরায় এক অপূর্ব স্পন্দন।

বাড়ি পৌঁছে নিজের ঘরে নিয়ে বিনয়কে বসিয়ে তপতী তাকে প্রণাম করতেই বিনয় সরে গিয়ে বলে উঠল—এ কি পাগলামী হচ্ছে বল তো ?

তপতী জবাব দিল—পাগল বল আর যাই বল আমার মন যা চাইল—তা করলুম। তবে শোন এসব করার কারণ কী ?

তপতীর গতরাত্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলা শেষ হলে বিনয় এক-চোট হেসে নিয়ে বলল—আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে এর চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। তোমার এইসব আজগুবি স্বপ্ন দেখার কারণ কি জানো ?

তপতী বাধা দিয়ে বলল—দোহাই তোমার এখন আর ওসব ব্যাখ্যা দিয়ে আমার মন খারাপ করে দিওনা। কাল রাত থেকে আমার খাওয়া হয়নি। তুমি একটু বস, আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসছি।

—তোমার আর রান্নাঘরে যেতে হবে না, আমি তোমাদের খাবার নিয়ে এসেছি। কথাগুলো বলতে বলতে জ্ঞানদা ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর দুটো থালা রাখল। থালার উপর বাটিতে পূজার প্রসাদ, থালায় লুচি-তরকারী। অবশেষে কফি।

জল খাবারের পাট চুকলে তপতী কিছুক্ষণ গল্প করে সে তানপুরায় সুর বাঁধল। তারপর কয়েকখানা সাধারণ গানের পর সে গাইল—

আবার আসিও তুমি মোর আঙিনায়।
ক'য়ো কথা কানে কানে (তব) মন যাহা চায় ॥
রহিব বাতায়নে পথ চাহিয়া,
রাখিব স্বযতনে আসন পাতিয়া ;
আসিও তুমি আপন ভাবিয়া—
আপন জন ঠায় ॥

বকুল কুসুম রাখিব কুড়ায়ে,
তব চরণ 'পরে দিব গো ছড়ায়ে ;
পাশেতে রহিবে যূথিকার মালা
পরিও গলে যদি মন চায় ॥

গানের বাণী বিনয়ের মর্মে প্রবেশ করে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে। লুব্ধ চোখে তপতীকে চুরি করে দেখতে গিয়ে সে ধরা পড়ে মুখ নিচু করে নিয়েছে।

তপতী গান শেষ করে মুখ টিপে হেসে বলল—খুব বাজে শোনাল, তাইনা ?

বিনয় জবাব দিল—এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা আমার শোভা পায় না। কারণ, আমি গান জানিনা। তবুও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলছি—শুধু আমি কেন—যে শুনবে সেই নিজেকে ধন্য মনে করবে। তবে এ গান শোনার যোগ্যতা আমার নেই।

তপতী উত্তর দিল—মিথ্যে বললে, তোমার শোনার যোগ্যতা অবশ্যই আছে, কিন্তু আমার শোনানোর যোগ্যতা নেই।

বিনয় কি একটা জবাব দিতে গেল কিন্তু বলা হল না। এই সময় জ্ঞানদা এসে খবর দিল, তার রান্না শেষ। অতএব গান বন্ধ করে উঠতে হল। স্নানের জন্য তপতী বিনয়কে বাথরুমে পাঠাল।

দুপুরে আহারাদির পর বিনয় বিদায় নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তপতী তাকে ছাড়েনি। একটার পর একটা কাজ দিয়ে আটকে রেখেছে। সে বিনয়ের কাছে যুক্তি নিয়েছে কিভাবে কালীতলায় সেলাই স্কুল করবে। প্রথমে কতগুলো মেসিন কেনা হবে, স্কুলের জন্য কেমন ঘর তৈরি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনয় তার ধারণা অনুযায়ী তপতীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছে। ঠিক হয়েছে বিনয় কলকাতা গিয়ে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি সহ দুটো একটা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে আসবে—যাতে কিছু কম দামে মেসিন কেনা যায়। অবশেষে সন্ধ্যা সমাগত হলে বিনয় তপতীর

কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বের হ'ল।

বিনয়কে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসার সময় তপতীর মনে হল, কে যেন সিঁড়ির পিছনে লুকিয়ে পড়ল। সে উপরে এসে ননীকে ঘটনাটা বলায় ননী পা টিপে নিচের ঘুরে এসে জানাল—জানো পিসি, দাদুকে দেখলাম ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে হন্ হন্ করে রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

বিনয় খেয়াঘাটে পৌছে দেখল নৌকা ওপারে যাচ্ছে। ঘুরে আসতে কম করেও দশ মিনিট। হঠাৎ টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এক বৃদ্ধ এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—বাবাজীর সঙ্গে ক'টা কথা ছিল।

বিনয় উত্তর দিল—বলুন।

—মহিমবাবুর মেয়ে অর্থাৎ তপতীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ-পরিচয়?

—কেন বলুন তো?

—এমনিই জিজ্ঞাসা করছি।

—আপনার পরিচয়?

—আমি মহিমবাবুর বন্ধু দয়াময় চক্রবর্তী। বর্ত্তমানে মহিমবাবুর যা ড়র দেখাশুনার দায়িত্ব আমার উপর। তাছাড়া তপতী মা আমার ভাবী পুত্রবধূ।

কথাটা শুনে বিনয়ের কৌতূহল জাগল। সে জিজ্ঞাসা করল—ভাবী পুত্রবধূ বলতে?

—হ্যাঁ বাবা ঠিকই। মহিমবাবু মৃত্যুশয্যায় থাকাকলীন আমাকে দিয়ে অঙ্গীকার ক'রয়ে নিয়েছিলেন আমি যেন ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিই।

—তপতী সে কথা জানে?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মায়ের ইচ্ছানুসারেই তো সব কথা হয়েছে। আর আমিও দেখলাম অভিভাবকহীন মেয়েটা কার পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাবে, তাইতো আমার ছেলের

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি মহিমবাবুকে কথা দিলাম। ভাবছি সামনের বৈশাখেই ··তা বাবা তুমি এখানে থাকলে অবশ্যই নিমন্ত্রণ পাবে।

খেয়া নৌকা প্রায় কূলে এসে গেছে। তা দেখে বৃদ্ধ বললেন—বাবাজী এসব গোপন কথা বললাম—পাঁচ কান না না হওয়াই ভালো।

নদী পার হয়ে বিনয় অন্ধকার পথে হোঁচট খেতে খেতে চলছে। রাস্তার দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বারবার ঘুরে ফিরে মনে প্রশ্ন জাগছে—একজনের বাগদত্তা হয়েও তপতী তাকে নিয়ে এমন অভিনয় করছে কেন? তবে কি সেই কলেজ জীবনের ঘটনার জের এখনও সে মনে মনে বয়ে বেড়াচ্ছে? তাই বা কি করে হয়? তাহলে সেবার জন্মদিনে তপতী তাকে অত আপ্যায়ণ করল কেন? বাড়ি পৌঁছেও সে ভাবনা থেকে মুক্তি পেল না। মনে পড়ল তপতীর সঙ্গে সেবার সিনেমা দেখার কথা। মনে পড়ল এখানে এসে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাতের কথা। আজ সকালেই রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে যা ঘটে গেল তা কি একেবারে মিথ্যে? বিনয় আর যেন কিছু ভাবতে পারে না। আজ সাহাবাবুদের বাড়িতে গিয়ে বড় বৌকে পড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু সেখানে যেতে পারল না। সে রাত্রে কিছু না খেয়েই সে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

পরদিন সকালে বিনয়ের মানসিক দ্বন্দ্ব কিছুটা কমল। তার মনে হ'ল তার সঙ্গে মেলামেশার জন্য নিশ্চয়ই তপতীকে অনেক গঞ্জনা সইতে হচ্ছে। অতএব ওর ভালো চাইলে উচিৎ আর ওদিকে না যাওয়া!

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। বিনয় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে। এমন সময় হেড মাষ্টারের ঘরে তার ডাক পড়ল। সে গিয়ে দেখল ব্রজবাবু একা বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বিনয় জিজ্ঞাসা করল—স্যার আমায় ডেকেছেন?

—ওহ্ হ্যাঁ বসুন। বিনয়বাবু, আপনি বোধ হয় সাপের লেজে পাড়া দিয়েছেন।

—তার মানে?

—মানেটা বুঝলেন না? কেউ আশা করে বসে আছে রাজকন্যে-সহ পুরো রাজত্ব দখল করবে, এখন তাতে যদি বাগ্ড়া পড়ে তাহলে তার মাথা ঠিক থাকে? এক প্রভাবশালী ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি দশ হাজার টাকার বিনিময়ে আপনাকে ছাঁটাই করিয়ে তাঁর অযোগ্য পুত্রকে মাস্টারী পাওয়াতে চান। তিনি আমার কাছ থেকে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন। তবে যে ভাবে তিনি টাকা ছড়াচ্ছেন তাতে তাঁর সফল হবারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ, আজকাল আদর্শের থেকে থোক্ টাকার আকর্ষণই অনেক বেশি। আমাদের স্কুল কমিটিতে যেমন ভালো লোক আছেন, তেমনি লোভী চরিত্র একটি-দুটি যে নেই একথা বলা যায় না। হয়তো অচিরেই আপনার নামে কোন কলঙ্ক রটে আপনাকে পদচ্যুতির কথা উঠতে পারে। জানিনা তেমন হলে আপনাকে কতখানি সাহায্য করতে পারব। আপনার মতো সৎ ও সমাজের হিতৈষী পরায়ণ ব্যক্তিকে যদি এভাবে হারাতে হয় তবে আমার দুঃখের অন্ত থাকবে না। আপনাকে আমি ছোট ভাইএর মতো স্নেহ করি, তাই কথাগুলো আগেভাগে বললাম, আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

বিনয় চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে ব্রজবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—দাদা, সময় থাকতে খবরটা জানিয়ে আমার বড়ই উপকার করলেন। আমাকে চরম অপদস্থ হবার হাত থেকে বাঁচালেন। আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আমার নিজের কাজ আরো শ্রম দিয়ে ভালোভাবে করতে পারি। সে ব্রজবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়ি এসে বিনয় একখানা পদত্যাগ পত্র লিখল। পরের দিন পোষ্ট অফিসে গিয়ে সেখানা রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে স্কুলের

ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল।

পরে একটা সপ্তাহ বিনয় অবাক হয়ে দেখল, তার বাড়িতে কেউ আর পড়তে আসছে না। সাহাবাবুদের অন্দরমহলেও তার যাতায়াত বন্ধ হয়েছে। প্রচার হয়েছে সে নাকি শহরের অনেক মেয়ে-বৌএর ইজ্জৎ নষ্ট করে এখানে এসে নতুন অভিযান শুরু করেছে। মহিমবাবুর বাড়িতে নাকি অসভ্যতা করার জন্য মার খেয়ে সেখানে তার যাওয়া বন্ধ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। একমাত্র মহেশ তার সংস্রব ত্যাগ করেনি। একদিন মহেশ এসে তাকে চুপি চুপি বলল—জানেন মাস্টার মশাই, দয়াময় বুড়ো এসে আমার বাবাকে বলে গেছে—আপনার কাছে পড়লে নাকি আমি খারাপ হয়ে যাব। আমি যদি অন্য মাস্টারের কাছে পড়ি তবে উনি টাকা দেবেন।

বিনয় তাকে জিজ্ঞাসা করল—তাহলে তুই কার কাছে পড়বি ?

—কেন, আপনার কাছে ?

—যদি তোর বাবা না আসতে দেন ?

—আমি পালিয়ে আসব। আমি মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে আপনার কাছে লুকিয়ে এসে পড়ে যাব।

—যদি তোর বাবা তোকে মারধোর করেন ?

—মারুক, আমার একটুও ব্যথা লাগবে না।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ সত্যি। নয়তো এই লাঠিটা দিয়ে আমার পিঠে মারুন— আমি একটুও কাঁদব না

বিনয় মহেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল— তুই আমার ছাত্র, আমার ছোট্ট বন্ধু, তোকে কি মারতে পারি রে !

২৪

গত কয়েকদিন হ'ল বিনয়ের কর্মহীন অবস্থা। কারণ সে স্কুলে যাচ্ছে না। তা ছাড়া কেউ তার কাছে পড়াশুনা করতেও আসছে না। দুপুরবেলা আহারাদির পর একটা অসমাপ্ত উপন্যাস শেষ করার উদ্দেশ্যে সে কাগজ-কলম নিয়ে বসল। ঘণ্টা দেড়েক একটানা লেখার পর সে মুখ তুলে দেখল মহেশ এসে বসে আছে। বিনয়ের মনে পড়ল সকালবেলা মহেশের সঙ্গে কথা হয়েছে আজ তারা ওপারে পীরের মেলা দেখতে যাবে। সে লেখা বন্ধ করে উঠল। তারপর ধুতি-পাঞ্জাবী পরে মহেশের হাত ধরে নদীর ধারে এল। এখান থেকে পার হতে পারলে খুব কাছে হয়। না হলে খেয়াঘাট পার হয়ে ঘুরে যেতে অনেক বেশি সময় লাগে। নদীতে নৌকায় অনেকেই মাছ ধরছে। মহেশের ডাকাডাকিতে একজন নৌকা এনে তাদেরকে পার করে দিল।

শিবনিবাসের অনতিদূরে এই স্থানের নাম রাণীনগর। চুর্ণীর পাড়ে অবস্থিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর জমাদার সাহেবের মাজার বা সমাধিস্থান। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একজন জমাদার বা সুদক্ষ সেনাপতি। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের মহিমায় তিনি ভোগ-লিপ্সা থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্‌তালার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন ? ধর্মের মহিমায় পরাক্রম সেনাপতি রূপান্তরিত হন ঈশ্বরপ্রেমিক জমাদার পীর সাহেবে। কি মুসলমান কি হিন্দু—ব্যধিগ্রস্থ হযে কিংবা অন্য কোন বিপর্যয়ে সকলে ছুটে আসে পীর সাহেবের দরগায়। তিনি কোরাণের পবিত্র বাণী বিতরণ করে বুভুক্ষ আত্মাকে শান্তি প্রদান করেন। তাঁর পাণি পড়া, তেল পড়া কিংবা চামড়ের হাওয়ায় দুরারোগ্য ব্যধি দূর হয়ে যায়। ক্রমে একদিন সেই মহাপুরুষের পার্থিব জীবনের অবসান হ'ল। দেহ কঙ্কণা তথা চুর্ণীর তীরে সমাহিত করা হ'ল।

স্থানীয় জন-সাধারণের বিশ্বাস—পীর সাহেবের অবিনশ্বর আত্মা মানব কল্যাণের নিমিত্ত এই স্থানে চির বিরাজমান। তাই আজও ফাল্গুণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ে এই সমাধি প্রাঙ্গনে মেলা বসে। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই পীর সাহেবের আশীর্বাদ কামনায় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে .এসে এখানে নতুন হাঁড়িতে রান্না করে খায়, সিন্নী বিতরণ করে, ছাগল, মোরগ ইত্যাদি উৎসর্গ করে। প্রতি সন্ধ্যায় স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান রমণীরা পীরের থানে মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বেলে দিয়ে যায়। বিশেষ করে ফাল্গুণ মাসের বৃহস্পতিবার-গুলোতে প্রচুর লোক সমাগম হয়ে মেলার আকার ধারণ করে।

বিনয় আর মহেশ ঘুরে ঘুরে মেলা দেখে এবং কিছু কেনা-কাটা করে পীর সাহেবের সমাধি ক্ষেত্রের সামনে এসে দাঁড়াল। বিনয় হাতদুটি জড়ো করে চোখ বন্ধ করতেই তার সুমুখে ভেসে উঠল—লম্বমান দাড়িবিশিষ্ট উজ্জ্বল রঙের এক সৌম্য পুরুষ—ঢিলা পায়জামা-কোর্তা পরে, তাজের টুপী মাথায় দিয়ে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে ওই বেদীর উপর নামাজ পড়ছেন। বিনয়ের শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল, মনে জাগল এক অপূর্ব সুখানুভূতি। সে সেই পুরুষের উদ্দেশ্যে মনে মনে উচ্চারণ করল—পীর সাহেব, আমার সকল গুনাহ্ মাফ কর। দোয়া কর, আমি যেন আমার আরাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে পারি। তোমায় অযুত অযুত সেলাম!

সে মনে মনে এসব কথা বললেও তার চিত্ত শান্ত হ'ল না। সেই প্রায়শঃ অন্ধকারে একটু দূরে তাকিয়ে তার মনে হল, তপতী ভিড় এড়িয়ে মাজারের দিকে আসছে। তার সঙ্গে জনা তিনেক স্ত্রীলোক। সম্ভবতঃ তপতী তাকে দেখতে পায়নি। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয় মনে করে এক অব্যক্ত ব্যথা বুকে নিয়ে বিনয় মহেশের হাত ধরে বাড়ির পথে পা দিল।

পরদিন সকালে খানিকটা বেলা হলে বিনয় পোষ্ট অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় ওপারের গনেশ বিশ্বাস এসে

হাইমাউ করে কেঁদে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। বিনয় তাকে বলল—আহা অমন করবেন না, কি হয়েছে তাই আগে বলুন।

—আজ দশ-বারোদিন ধরে আমার আট বছরের ছেলে গোবিন্দ অসুকি ভুগ্ দিছে। কাল রাত্তির থিকে ভুল বক্তিছে।

বিনয় রাগ করে বলল—এতদিন কি করছিলেন। ডাক্তার দেখান নি?

—হ্যাঁ দেখাইছি।

—কোন্ ডাক্তার দেখেছেন?

—হাসপাতালের দাক্তার, কিন্তুক কাজ হল দা।

গণেশের অবস্থা দেখে বিনয়ের মায়া হল। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তারী ব্যাগ নিযে বলল—চলুন।

বিনয় গণেশের বাড়ি পৌঁছে দেখল গোবিন্দ তখনও ভুল বকে চলেছে। শরীরে উত্তাপ তেমন নেই কিন্তু পেটটা বেশ ফোলা। সে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে এল— হজমের গোলমালে দীর্ঘদিন পেটে মল পচে কৃমি হয়েছে। অবশেষে কৃমিবিকারের ফলে বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। যদি কৃমিকে আস্তে আস্তে বশে না আনা যায় তাহলে ছেলেটির মৃত্যু অবধারিত। বিনয় বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে ওষুধ নির্বাচন করল—তারপর নিজে হাতে খাইয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টা দুই পরে সে নিশ্চিন্ত হল—ওষুধে কাজ হয়েছে। গোবিন্দ এখন অকাতরে ঘুমুচ্ছে। বিনয় হাতের ঘড়ি দেখল, প্রায় একটা বাজে।

গণেশ কিছুক্ষণের জন্য কোথায় গিয়েছিল। এখন ফিরে এসে ধুতির খুট খুলে একটা কাঁচা টাকা বের করে বিনয়ের পায়ের কাছে রেখে বলল—দাক্তারবাবু, আমারে ক্ষ্যামা করেন, আমি গরীব মানুষ ....

বিনয় গণেশের অবস্থা উপলব্ধি করে নিজের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—আমাকে

কিছু দিতে হবে না। এই টাকাটা রাখুন,— যা যা খেতে বলেছি—আনিয়ে খাওয়াবেন, কেমন? আর কোন ভয় নেই। তবুও যদি মনে করেন—সন্ধ্যার দিকে একবার আমাকে খবরটা দিয়ে আসবেন।

ইতিমধ্যে গনেশের বৌ প্রতিমা পাশের বাড়ি থেকে এক বাটি মুড়ি ধার করে এনে বিনয়ের সামনে ধরে দিতেই সে ধমক লাগাল—এ আপনারা কি লাগিয়েছেন?

গনেশ হাত জোড় করে উচ্চারণ করল—আপনি সেই সকাল থিকে ·· ·· ··

বিনয় উত্তর দিল—বিশ্বাস করুন, আমার কোন খিদে পায়নি। আমি এক্ষুনি গিয়ে খাব। কিন্তু ওরা পাছে কষ্ট পায় এই ভেবে সে বাটি থেকে একমুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে চিবিয়ে খেল। তারপর জল পান করে বলল—আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমার যা প্রয়োজন তা খেয়েছি, এবার আমি উঠি।

২৫

সকাল থেকে কতকগুলো দরকারী কাজ সারতে তপতীর বেশ বেলা হয়ে গেছে। সে স্নান সেরে ভিজা জামা-কাপড় মেলে দিতে ছাদে গিয়ে দেখতে পেল একটি লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পিছন দিক দেখে তবুও তার মনে হ'ল লোকটি বিনয় ছাড়া আর কেউ নয়। তপতী ননীকে পাঠাল তাকে ডেকে আনতে।

ননীগোপাল দৌড়ে গিয়ে বিনয়ের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে বলল—পিসিমণি আপনারে ডাকতেছে।

বিনয় বলল—তোমার পিসিকে বল—এখন আমার সময় নেই, পরে সুবিধামতো আসব।

ননী বিনয়ের ডাক্তারী ব্যাগ ধরে বলল—না আপনারে যেতিই হবে, না হলি পিসিমণি আমারে মারবে।

অগত্যা বিনয়কে পিছন ফিরতে হল। সে বলল—ঠিক আছে তোমার পিসিমণিকে গেটের কাছে আসতে বল। আমি কথা বলেই চলে আসব—আমার কিন্তু বসার সময় নেই।

ননীর ফিরতে দেরি দেখে তপতী চিরুণি হাতে করে নিচের সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখল বিনয় আসছে। তাব মন খুশিতে ভরে উঠল।

বিনয় দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে তপতীকে প্রশ্ন করল—আমাকে আবার ডেকে পাঠালে কেন?

তপতী হেসে জবাব দিল—এভাবে কি বলা যায়? কাল মেলার মধ্যে তোমাকে দেখলুম—তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পেলুম না। এ'কদিন আসনি কেন? তপতী বিনয়ের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে বিস্মিত হ'ল। সে পুনরায় বলল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো, উপরে চল।

বিনয় মেলার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে শুধু বলল—না, এখন উপরে যাবার সময় নেই, আমি ব্যস্ত আছি।

বিনয়ের কথা বলার ধরণ দেখে তপতীব বুক কেঁপে উঠল। বুঝল, কিছু একটা ঘটেছে। সে ননীকে বাথরুমের চৌবাচ্চায় টাট্‌কা জল ভরার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে বিনয়ের উদ্দেশ্যে বলল রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে এমন তামাসা করার কোন মানে হয়না—উপরে গিয়ে ঘরে বসে তোমার যা খুশি শুনিও, আমি একটুও রাগ করব না।

বিনয় নিচু গলায় বলল—দেখ এ ভাবে আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে সে আমি চাইনা।

—আমার সর্বনাশ কি উপকার সে আমি বুঝব, দয়া করে রঙ্গ না করে তুমি উপরে চল এই আমার অনুরোধ!

বিনয় কোন উপায় না দেখে আর কথা না বাড়িয়ে তপতীকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল।

উপরের ঘরে এসে তপতী বাক্স থেকে কাচা ধুতি-তোয়ালে, নতুন সাবান ও মাথার সুগন্ধি তেল এনে বিনয়ের পাশে রেখে বলল—আমি ওঘরে যাচ্ছি, তুমি জামা-কাপড় পাল্টে বাথরুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

বিনয় জামা-কাপড় পাল্টানোর কোন লক্ষণ না দেখিয়ে বলল—আমার উপর তুমি এভাবে জোর খাটিয়ো না, এর পরিণাম ভালো না-ও হতে পারে!

তপতী বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুলে চিরুণি দিয়ে বলল—তোমার এসব কথার জবাব পরে দেব। আমি সকাল থেকে অভুক্ত আছি, এখন বল—তুমি আমায় খেতে দেবে কি না। যদি তা চাও তাহলে আর দেরি না ক'রে স্নান সেরে এসো, আমি নিচেয় যাচ্ছি।

বিনয় বুঝল তপতীর কথা অমান্য করা মুস্কিল। অতএব সে স্নানের জন্য বাথরুমের দিকে গেল। ফিরে এসে দেখল তার খাবার দেওয়া হয়েছে।

বিনয় আসনে বসতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমার খাবার কই?

—আমি পরে খাচ্ছি।

—না না, তা কি করে হয়? তুমি না বসলে ....

—নিশ্চয়ই হবে, আমি পরে বসছি। তুমি আমার অতিথি, তোমাকে না খাইয়ে আমি কি খেতে পারি?

—তাতে ক্ষতিটা কি?

—সব ক্ষতি কি চোখে দেখা যায়? নাও আর কথা বাড়িও না, এবার শুরু কর।

—বেশ তাই করছি। কিন্তু এত বড় মুড়ো আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়, আমি অভ্যস্থ নই।

—অভ্যস্থ না হলেও তোমাকে খেতে হবে, তোমারই এটা প্রাপ্য।

—কারণ ?

—বাজারে যাবার লোক ও সময়ের অভাবে আমাদের বাড়িতে সব দিন মাছ রান্না হয় না। আজ সকালে একজন আব্দার করে এত বড় মাছটা বিক্রি করে গেছে—তুমি আসবে জেনেই বিধাতা বোধ হয় .....

তপতীর কথায় বিনয়ের হাসি পেল। সে বলল—বিধাতা পাঠান আর যিনিই পাঠিয়ে থাকুন—অত বড় মুড়ো আমি খেয়ে শেষ করতে পারব না।

—যতটা পারো খাও, না পারলে ফেলা যাবে না; বাড়িতে খাবার লোক আছে।

—কে খাবে শুনি! তুমি ?

—কেন, দোষ আছে কিছু ?

—তাহলে কেলেঙ্কারীর আর বাকী রইল কী: ও আমি হতে দিতে পারিনা, সে অধিকারও আমার নেই!

—আচ্ছা তোমার কি হয়েছে খুলে বলতে পার ? আজ তুমি এভাবে কথা বলছ কেন ?

—আমাকে বলতে হবে কেন, সে কথা তুমি নিজেই ভালোমতো জানো!

—দোহাই তুমি আগে খেয়ে ওঠো। তারপর দু'জনে মুখোমুখি বসে আলোচনা করা যাবে।

বিনয় আর কথা না বাড়িয়ে খাওয়া শেষ করল। মুখ ধুয়ে এসে দেখল—তপতী নিজের বিছানায় তার শোয়ার ব্যবস্থা করছে। সে বলে উঠল—তুমি এখন ওসব করছ, খাবে কখন ?

তপতী কয়েকটি এলাচের দানা বিনয়ের হাতে দিয়ে বলল—এখনই খাব। তুমি খানিকটা বিশ্রাম নাও, আমি সেই ফাঁকে খেয়ে নিচ্ছি। তোমাকে একটা অনুরোধ করছি,

খাবার সময় আমার দিকে তাকাবে না বা কথা বলবে না। তাহলে কিন্তু আমার খাওয়া হবে না, মনে রেখ।

বিনয় এলাচের দানা মুখে ফেলে কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার দৃষ্টি তপতীর ভাতের থালায় গিয়ে পড়তেই সে তপতীর নিষেধ অমান্য করে বলে উঠল—এ তুমি কী করলে? যদি কেউ জানতে পারে?

তপতী বিনয়ের উচ্ছিষ্ট পাতের মাছভাত মুখে পুরে গলাধকরণ করে অবশেষে হেসে জবাব দিল—তুমি যখন জেনেছ তখন আর কাউকে আমার ভয় নেই।

—তপতী তুমি কি বলছ—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না?

—তোমার বোঝার দরকার নেই, যা দেখলে তা মনে মনে রাখ।

তপতীর জবাব শুনে বিনয় সংশয়চিত্তে বলে উঠল—আমি তোমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি যা করলে এর জন্য যদি তোমাকে কষ্ট পেতে হয় তাহলে আমার কিছুই করার নেই।

তপতী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল—ভালোবাসতে গেলে অনেক কষ্টই নীরবে সহ্য করতে হয় তা আমার জানা আছে।

—তপতী তুমি আশ্চর্য মেয়ে তো। তোমার কি একটুও ভয় করছে না?

—তুমি যতক্ষণ কাছে আছ ততক্ষণ আমার কোন ভয় নেই।

—তপতী তোমার হেঁয়ালীপূর্ণ কথা বন্ধ করতে পার!

—আমার সহজ কথাকে তোমার হেঁয়ালী মনে হচ্ছে বুঝি?

—হ্যাঁ হচ্ছে। কারণ, ত্বদিন পরে তোমার এই কথার কোন অর্থই থাকবে না। এই সকল ঘটনার স্মৃতি শুধু তোমার কষ্টকে বাড়িয়ে তুলবে।

—কেন, তুমি কি আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে .....?

—আমি নই, তপতী তুমি ! তুমি নিজের কথা বল।

তপতী আর এক চোট হেসে নিয়ে বলল—দাঁড়াও মুখ ধুয়ে এসে তোমার কথার জবাব দিচ্ছি। একটু পরে সে ফিরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল—আমি জানতুম তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না।

—তপতী তুমি জানতে আমি তোমাকে ভালোবাসি না ?

—অত বক্‌বক্ ক'রো না, এখন শুয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি তোমার মাথা টিপে দিচ্ছি। তপতী তার ডান হাতখানা বিনয়ের হাতের উপর রাখল।

বিনয় নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলল—তুমি আমাকে স্পর্শ করার আগে আমার কথার জবাব দাও।

—তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসলে আমার কথার এমন অবাধ্য হতে ?

বিনয় ক্ষুব্ধ অভিমানে বলে উঠল—দেখ তপতী ভালোবাসা কাকে বলে একদিন তা বুঝতুম না। তারপর অনেকদিন পরে মনে হ'ল একজন আমাকে সত্যিই ভালোবাসে, কিন্তু আমি তার যোগ্য নই। আমার সে ক্ষুদ্রতা তার কাছে কখনও লুকানোর চেষ্টা করিনি। তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছি আমি ছিলুম তার প্রেমের স্বর্গে অধিষ্ঠিত দেবতা। আজ মনে হচ্ছে, আমার ধারণায় কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল। যখন তার ভালো-বাসার কথা জানতুম না তখন কিছুই মনে হয়নি। তাকে হারানোর মুহূর্তে এমন ব্যথা পাব তা কখনও বুঝতে পারিনি—আর বোধ হয় না হারালে বোঝাও যায় না ·····

তপতী এবার বিনয়ের চোখে চোখ রেখে বলল—তাহলে এখন বুঝতে পারছ প্রিয়জনকে হারালে কিংবা দুঃখ দিলে নিজের কেমন কষ্ট হয় ?

বিনয় এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না এক উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তপতীর দিকে তাকিয়ে রইল।

তপতী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—প্লীজ! শুয়ে পড়, আমি তোমাকে সেবা করে একটুখানি আনন্দ উপভোগ করি। সে আলতো করে বিনয়কে ঠেলে শুইয়ে দিল। তারপর নিজের সুচারু আঙুলগুলো বিনয়ের মাথার চুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে টিপে দিতে লাগল।

গত কয়েক রাত্রি বিনয়ের ঘুমের বেশ ব্যঘাত হচ্ছিল। কতকটা ক্লান্তির বশে, কতকটা মানসিক তৃপ্তির গুণে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

চেয়ারে বসে তপতী যখন লুব্ধ চোখে ঘুমন্ত বিনয়ের মুখ, চুল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা দেখছিল তখন জ্ঞানদা এসে খবর দিল—দয়াময়বাবু দেখা করতে চান।

তপতী বিরক্ত হ'ল। বলল—তুমি গিয়ে বল আমি ঘুমিয়ে রয়েছি।

জ্ঞানদা নিচেয় গিয়ে সেই কথা বলায় দয়াময়বাবু বললেন—আচ্ছা আমি অপেক্ষা করছি, মা জননীর ঘুম ভাঙলে আমাকে খবর দিও।

—আপনি বরং কাল সকালের দিকে ·····

—না, আজ আমি দেখা করে তবে যাব।

জ্ঞানদা আর কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে দয়াময়বাবু আবার জ্ঞানদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা জননীর কি এখনও ঘুম ভাঙল না? কথাগুলো তিনি এমন জোরে জোরে বললেন যা সরাসরি উপরে তপতীর কানে গিয়ে পৌঁছাল। তপতী বিরক্তি সহকারে নিচেয় নেমে গিয়ে দেখল দয়াময়বাবু ও হৃদয় দু'জনেই ঘরে উপস্থিত রয়েছে। তাকে দেখে দয়াময়বাবু বলে উঠলেন—এই যে মা তোমার সঙ্গে ক'টা বাচনিক কথা আছে—আমি সেই বেলা তিনটে থেকে বসে আছি। কিন্তু তোমাকে আর পাবার উপায় নেই। সেদিন এসে শুনলাম, কোন্ মাস্টারের সঙ্গে গল্প করছ।

আবার আজ এসে শুনি তুমি ঘুমিয়ে আছ। অথচ আমার কাছে খবর আছে তুমি অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত! আমার জানা দরকার সেই অতিথি ব্যক্তিটি কে?

লজ্জা ও রাগে তপতীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তবুও সে শান্তভাবে উচ্চারণ করল—কাকাবাবু, আমি আপনাকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করি। আপনি অন্য সময় আসবেন, সব বলব। আমি মিনতি করছি, আপনি এখন কথা বাড়াবেন না—কারণ, ভদ্রলোক উপরে ঘুমুচ্ছেন। উনি খুব পরিশ্রান্ত, এখন ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানো কারও উচিৎ হবে না।

কিন্তু দয়াময়বাবু চুপ করার পরিবর্তে গলা চড়িয়ে বললেন—তোমার বাবা মৃত্যুশয্যায় তোমার দেখাশোনার ভার আমাকে দিয়ে গেছেন—তাই আমার এত মাথা ব্যথা। কিন্তু তুমি দিনের পর দিন আমাকে অবজ্ঞা করে, তোমার ভাবী স্বামীকে উপেক্ষা করে যাদের কোন চাল-চুলো নেই, চরিত্রের বালাই নেই, সেইসব বাউণ্ডুলে লোককে ঘরে ডেকে নিয়ে যা খুশি তাই করছ—অথচ লজ্জায় আমাদের বাব-বেটার মাথা কাটা যাচ্ছে!

—উহ্ কাকাবাবু! তপতীর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। সে মেঝেয় পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারাল। পড়ে যাওয়ার সময় চেয়ারের হাতলে লেগে মাথার পিছনের দিকে কেটে রক্ত বের হচ্ছে।

তার পড়ে যাওয়ার শব্দ কানে যেতে জ্ঞানদা ও ননী চিৎকার করে ছুটে এসেছে। বিনয়ের ঘুম আগেই চলে গিয়েছিল। খাটের উপর বসে নিচের কথাবার্তা শুনছিল। এখন জ্ঞানদার চিৎকার শুনে সে আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না। তাড়াতাড়ি ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে নিচের ঘরে এল। সে স্টেথোস্কোপ নিয়ে পরীক্ষার জন্য তপতীর দেহের উপর ঝুঁকে পড়তেই হৃদয়নাথ ঘুসি পাকিয়ে বলল—খবরদার শয়তান,

ডাক্তারীর নামে তুমি ওকে নিয়ে যা-তা করবে সে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

হৃদয়ের কাণ্ড দেখে জ্ঞানদা উচ্চস্বরে বলে উঠল—আপনারা বাপ-বেটায় এ কি শুরু করেছেন? মেয়েটা মরে যাবে যে!

জ্ঞানদার কথায় হৃদয়ের শুভবুদ্ধি জাগল। সে বলল—বাবা, তুমি এখানে থাক, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি। হৃদয় বেরিয়ে গেলে দয়াময়বাবু বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলেন।

বিনয় উপস্থিত ঘটনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। নিজের অপমানের থেকেও সে বসে বসে ভাবছে আসলে এরা কী চায়?

এইসময় জ্ঞানদা বলল—ডাক্তারবাবু আপনি চুপ করে বসে থাকবেন না, ওকে বাঁচান।

বিনয় আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি ডেটল-তুলো দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ক্যালেণ্ডুলা লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। অতঃপর 'পাল্স' ও 'প্রেসার' দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। তপতী ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছে। সে চোখ খুলে বিনয়ের একটা হাত চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পরমুহূর্তে চোখের জল মুছে মেঝেয় উঠে বসে বলল—আমাকে উপরে নিয়ে চল। সে সকল লজ্জা-সরম ত্যাগ করে বিনয় ও জ্ঞানদার কাঁধে ভর দিয়ে উপরের ঘরে এসে সোফায় হেলান দিয়ে বসল।

বিনয় বলল—এবার তুমি বিশ্রাম নাও, আমি চলি।

—যাবে? আচ্ছা যাও। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ—ওদের ব্যবহারে তোমার যাই মনে হয়ে থাক—তুমি কিন্তু ভুল বুঝে আমাকে ত্যাগ করে যেও না। তাহলে আমার মরণ ছাড়া গতি নেই। কাল সকালে এসে তুমি কয়েকটা ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে।

বিনয় ডাক্তারী ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল—দেখ তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে জড়িয়ে আমাকে বারবার কষ্ট দেওয়া তোমার মোটেই উচিৎ হচ্ছে না।

জ্ঞানদা ঘরে নেই। তপতী খপ্ করে বিনয়ের একটা হাত ধরে বলে উঠল—ঘরোয়া ব্যাপার অন্য কারো নয়, সে একান্তভাবে তোমার আর আমার, বলো আসবে?

—চেষ্টা করব। বিনয় বিদায় নিল।

কিছুক্ষণ পরে হৃদয়নাথ একজন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলে তপতী হাতজোড় করে বলল—দোহাই আপনাদের, আমাকে এখন বিরক্ত করবেন না। আমি মনে করি, নিজের বাড়িতে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার সকলের মতো আমারও আছে। কথাগুলো শেষ করেই সে দরজায় খিল তুলে দিল।

বন্ধ দরজার সামনে হৃদয়নাথ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নিষ্ফল আক্রোশে অশ্রাব্য মন্তব্য করতে করতে ডাক্তারের পিছু পিছু নিচেয় নেমে গেল।

২৬

সে রাত্রে তপতী দুই চোখের পাতা এক করতে পারল না। নানারকম উদ্বেগ ও আশংকার মধ্যে তার রাত্রি ভোর হল। পড়ে যাওয়ায় কোমর থেকে পিঠের ডানদিকের অংশে এখনও ব্যথা রয়েছে। গলাটা শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। সে টেবিলের উপর থেকে গেলাস টেনে নিয়ে জল খেল। তারপর বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বড় আয়নার সমনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। মাথার চুলে কাটা জায়গাটা ঢেকে আছে। চুল না সরালে বোঝার উপায় নেই। ভাগ্য ভালো যে, অন্যের উপর

দিয়ে গেছে। শরীরটা বেশ দুর্বল লাগছে। সে ওষুধ খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরে জ্ঞানদা এসে কুশল জিজ্ঞাসা করে অবশেষে বলল—না তপতী. এবার তুমি একটা ব্যবস্থা নাও, নইলে বেঘোরে তোমার প্রাণ যাবে। তোমার বাড়ি চড়াও হয়ে তোমাকে শাসানো, তোমার অতিথিকে অপমান করার সাহস যারা রাখে, তুমি কি ভাবো তারা তোমায় সুখে রাখবে? আমি বলতে পারি, তুমি ওই বুড়োর ছেলের বৌ হলে তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে রেখে তোমার সব সম্পত্তি হাতাবে। না বাপু, এখন দেখছি তোমার এখানে আসা মোটেই উচিৎ হয়নি। তুমি জানে-মানে বাঁচতে চাও তো রাণাঘাটে চল।

তপতী জবাব দিল—পিসি, আগে যেতুম ভালোকথা; কিন্তু এখন আর যাবার উপায় নেই। বিশেষ করে আর এক-জনের জন্য আমার পক্ষে এখন এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তার বিপদ-আপদে যে কেউ নেই খবর নিয়ে জানলুম ওর চাকরিটাও নেই। এখানে সে কি খাচ্ছে, কি করছে কিছুই জানতে পারছি না। অথচ আমি জানি, না খেয়ে মরে গেলেও ওর দুরাবস্থার কথা কাউকে মুখ ফুটে বলবে না।

—তবে তুমি ভেবে ভেবে মর আর কি!

জ্ঞানদা নিজের কাজে ফিরে গেল। তপতী শুয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে—কখন বিনয় এসে ডাক দেবে। ক্রমে বেলা বাড়ছে কিন্তু বিনয়ের দেখা নেই। একসময় তপতীর মনে প্রশ্ন জাগল—তবে বিনয় কি তাকে ভুল বুঝল! গতকাল তার কথা-বার্তায় তাই তো মনে হয়েছে। সর্বনাশ! এখন তবে উপায়? তপতীর কান্না পেল, দু'চোখে নামল বন্যার ঢল।

সারাদিন প্রতীক্ষা করেও সেদিন তপতী বিনয়ের দেখা পেল না। সে নিশ্চিন্ত হ'ল, বিনয় আর সহজে এদিকে আসবে না।

পরেরদিন সকালবেলা সে যখন বিনয়ের বাড়িতে যাবার কথা ভাবছে তখন জ্ঞানদা এসে খবর দিল, কৃষ্ণনগর থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। তপতী নিচের ঘরে এসে দেখল, আইনজীবি সুব্রত বসু। ইনি তাদের মামলা পরিচালনা করছেন। বছর দুই আগে একবার এসেছিলেন। ভদ্রলোক বললেন—তপতী দেবী, শুনলুম আপনি মামলাটা আর চালাতে চান না, কথাটা বিশ্বাস হ'ল না, তাই জানতে এলুম।

তপতী জবাব দিল—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন।

—এতগুলো টাকার সম্পত্তি আপনি শুধু শুধু ছেড়ে দেবেন?

—কি আর করি বলুন! মামলায় জিতলেও ওদেরকে আমার ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

—কারণ?

—কারণ আর কিছুই নয়, ওদেরকে বাস্তুচ্যুত করতে আমার বিবেকে বাঁধছে। ওরা একবার বাস্তুচ্যুত হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, আবার কোথায় তাড়াব?

—কিন্তু এভাবে আপনি সব মানুষের দাবী বা প্রয়োজন মেটাতে পারবেন কি?

—সব মানুষের দাবী মেটানো আমার সাধ্যে কুলাবে না জানি; কিন্তু যেটা আমার সাধ্যের মধ্যে তা পালন না করলে নীতিগতভাবে এবং মানবিক বিচারে অন্যায় করা হবে।

—আমার পাওনাটাও কিন্তু অনেকদিন ধরে বাকী রয়ে গেছে।

—এ মা, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, গত দুই বছরে মাত্র পঞ্চাশ টাকা আমি পেয়েছি।

—মিষ্টার বাসু, আমাকে ক্ষমা করবেন। বিশ্বাস করুন, আপনার বাবদ আমি চার বারে মোট দুই হাজার টাকা দয়াময়বাবুকে দিয়েছি।

—আগের টাকা আমি পেয়েছি।

—আগে নয়, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে।

—তবে আর সে টাকা আমি পাইনি।

—আপনি একটু বসুন আমি উপর থেকে চেক্ বইটা নিয়ে আসি।

সুব্রতবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িযে বললেন—না আপনাকে কষ্ট করে চেক্ বই আনতে হবে না; আমি আর টাকা চাই না। আপনি বরং দয়াময়বাবুর কাছ থেকে দেওয়া টাকাটা ফেরৎ চেয়ে নেবেন।

—সে কি করে হয়; আপনার পারিশ্রমিক নেবেন না?

—আগে যা নিয়েছি, নিয়েছি। আর নতুন করে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আপনি একটা মহৎ উদ্দেশ্যে মামলাটা তুলে নিচ্ছেন।

—তবে আর কি বলব? আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কিছু মুখে দিয়ে তবে যাবেন, নইলে এ বাড়ির অকল্যাণ হবে।

সুব্রতবাবু হাসলেন। বললেন—আচ্ছা আচ্ছা আমি বসছি। তাহলে কফি খাওয়ান। সেবার আপনাদের বাড়িতে চমৎকার কফি খেয়ে গিয়েছিলুম।

—আচ্ছা বসুন, আমি নিজে হাতে তৈরি করে আনছি। তপতী ভিতরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চিঁড়ে ভাজা ও কফি এনে সুব্রতবাবুকে খেতে দিল।

সুব্রতবাবু যখন বিদায় নিলেন তখন রোদ্দুর বেশ চড়া হয়েছে। দুর্বল শরীরে বাইরে যাওয়া তপতীর সাহসে কুলাচ্ছে না। কিন্তু বিনয়ের খবরটা নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ভয় হচ্ছে সে কোথাও না চলে যায়। তপতী সাত-পাঁচ ভেবে ডাক দিল—ও ননী, ননী?

জবাব এল—এই যে পিসিমণি আমি এখানে।

—এই পাজি ছেলে এখন জামগাছের মগ্‌ডালে উঠেছিস

কেন? পড়ে হাত-পা ভাঙবি তো! শীগগির ওখান থেকে নেমে আয়।

—আসছি।

গাছ থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে ননী এসে দাঁড়ালে তপতী দেখল ওর হাতে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি। সে ধমক দিল—এর জন্য তুই মরতে গাছে উঠেছিলি? হায় আমার কপাল! বল তোর ক'টা ঘুড়ি চাই? এই নে দু'টাকায় যে কটা ঘুড়ি হয় কিনে আন। ভালো কথা তুই আমার একটা কাজ করে দিবি?

—কি কাজ পিসিমণি?

—সেই সেদিন যেখানে গিয়েছিলুম, সেই মাস্টারমশাইএর বাড়ি তোর মনে আছে?

—হ্যাঁ আছে।

—সেখানে গিয়ে চুপি চুপি দেখে আসবি মাস্টার এখন কি করছে। শুধু দেখেই চলে আসবি। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবি, কাঁঠালগাছে ঘুঘুর বাসায় ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে কিনা দেখতে গিয়েছিলি।

ননী বলে উঠল—পিসিমণি কটা ডিম হয়েছে?

ননীর প্রশ্নে তপতী হেসে ফেলল। বলল—দূর বোকা! তুই তাই বিশ্বাস করলি?

—তুমি যে বললে!

—যাক্ তোকে অতশত বলতে হবে না, তুই শুধু দেখেই চলে আসবি, কেমন?

—আচ্ছা। ননী ছুট দিল।

তপতী ডেকে বলল—অমন ছুটিস না, হাঁপিয়ে যাবি; আস্তে আস্তে যা।

—তাই যাচ্চি। কথাটা বলেই ননী আরও জোরে ছুট দিল। তারপর প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে ননী ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। তার হাতে পাঁচখানা ঘুড়ি। তপতী জিজ্ঞাসা করল—কিরে খবর কি?

—মাস্টারমশাই রান্না করছে। জানো পিসি আমি যেই কাঁঠালগাছে উঠেছি অমনি মাস্টারমশাই হাঁক দিয়েছে—কে রে? আমি শুনেই এক লাফে গাছ থেকে নেমে দিয়েছি লম্বা দৌড়!

—বেশ করেছিস। এখন চান করে খেয়ে নে। তারপর বিকালবেলা মাঠে গিয়ে যত পারিস ঘুড়ি ওড়াবি—আমি একবারও বারণ করব না।

ননী সেখান থেকে চলে গেলে তপতী ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। সে এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত। এখন দু'একদিন দেখতে চায় বিনয় নিজে থেকে এদিকে আসে কিনা।

পরেরদিন দুপুরের কিছু পরে তপতী দোতলার বারান্দা থেকে দেখতে পেল রাধাবিনোদবাবু তাদের বাড়ির দিকেই আসছেন। তপতী তাড়াতাড়ি নিচেয় নেমে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—আসুন কাকাবাবু, মনে মনে এ ক'দিন আপনাকেই খুঁজছিলুম। আপনার শরীর ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ মা ভালো আছি। তোমার কথার অর্থ তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—উপরে গিয়ে ঘরে বসুন, সব কথা বলছি। আপনি এখন কোথা থেকে এলেন?

—আমার ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে আজ সকালে বাড়ি এসেছি। কালকের দিন থেকে পরশু ভোরেই আবার চলে যাব। তোমার কথাটা মনে হতেই চলে এলাম, ভালো আছ তো মা?

—একরকম আছি কাকাবাবু।

উপরের ঘরে এসে তপতী বলল—আপনি একটু বসুন, আমি চা করে আনছি।

তার কথা শুনে জ্ঞানদা বলল—তোমরা কথা বল, আমি চা করে দিচ্ছি।

তপতী বাধা দিয়ে বলল—না, কাকাবাবুকে আমি নিজে হাতে চা করে খাওয়াব।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—আচ্ছা মা তাই হোক, তুমিই কর। কিন্তু একটু চিনি কম দিও। কিছুদিন আগে আমার 'ডায়াবিটিস' হয়েছিল। এখন অবশ্য ভালো হয়ে গেছি, তবে চিনিটা একটু কম খাচ্ছি।

তপতী মিনিট দশেক পরে চা এবং কিছু নোন্তা বিস্কুট এনে রাধাবিনোদবাবুকে খেতে দিল।

তারা দুজনে বসে গল্প করছে এমন সময় দয়াময়বাবু এসে দাঁড়িয়ে বললেন—মা জননী, আসতে পারি?

—হ্যাঁ আসুন!

দয়াময়বাবু ভিতরে ঢুকে রাধাবিনোদবাবুকে দেখে একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন। একটু আগে নিচের ঘরে বসে তাঁর কানে আসছিল তপতী যেন কার সঙ্গে গল্প করছে। ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই হারামজাদা বিনয় মাস্টার। তাঁর ইচ্ছা ছিল তপতীকে অপ্রস্তুত করা। কিন্তু ঘটনা ঘটলো একেবারে উল্টো। তিনি রাধাবিনোদ ডাক্তারকে মনে মনে ভয় করেন। এর পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে! দয়াময়বাবু বলে উঠলেন—আমি বরং সন্ধ্যাবেলা আসব।

তপতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল— না না আপনি চলে যাবেন না, আপনার সঙ্গে এক্ষুনি আমার জরুরী কিছু কথা আছে। আপনি নিচের ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি। সে জ্ঞানদাকে ডেকে বলল—পিসি, দয়াময়কাকুকে হরলিক্স করে দাও তো।

দয়াময়বাবু বাধ্য হয়ে নিচের ঘরে এসে বসলেন। কারণ, ননী সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তপতী রাধাবিনোদবাবুকে বলল—কাকাবাবু আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, চলে যাবেন না যেন! আপনার উপস্থিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। ঈশ্বরের অসীম

করুণায় আমি আজ দু'জনকে এক সঙ্গে পেয়েছি। তপতী আর না দাঁড়িয়ে নিচেয় ছুটল।

নিচের ঘরে দয়াময়বাবু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন। টেবিলের উপর গেলাসে হরলিক্স ঠাণ্ডা হচ্ছে। তপতী ঘরে ঢুকে বলল—কাকাবাবু বসে আছেন কেন? ওটা খেয়ে নিন।

—এই খাচ্ছি মা।

হরলিক্স খাওয়া শেষ হলে তপতী বেশ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমাদের মামলা বাবদ এ যাবৎ কত টাকা খরচ হয়েছে বলুন তো?

দয়াময়বাবু একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—হিসেব করে বলতে হবে।

—আপনি আর কতদিন ধরে হিসেব করবেন? গত ছ'মাস ধরে যখনই ওই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি আপনি বেশ কায়দা করে এড়িয়ে যান। বাবার কাছ থেকে এবং আমার কাছ থেকে এই তারিখগুলোতে মোট আট হাজার পাঁচশো টাকা নিয়েছেন। কিন্তু উকিল সুব্রত বসু মাত্র তিন হাজার পঞ্চাশ টাকা পেয়েছেন। আমি নিজে হাতে করে আপনাকে চারবারে দু'হাজার টাকা দিয়েছি, কিন্তু আপনি তাঁকে মাত্র পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছেন। বাকী এইসব টাকাগুলো আপনি আমাকে কাল সকালেই ফেরৎ দিয়ে যাবেন।

—না না, এসব মিথ্যে কথা

—আপনি বুঝি সব সত্যি কথা বলছেন? উনি যে যে তারিখে আপনার কাছ থেকে যত টাকা নিয়েছেন, তারিখ অনুসারে সব লিখে রেখেছেন। আমাকে সব দেখিয়ে গেছেন। ঠিক আছে আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে বলুন কবে আপনি প্রমাণ দিতে তার বাড়িতে যাবেন?

—এই মানে এখন আমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না কিনা……

—আপনি স্বীকার করুন সেখানে যাবার আপনার সাহস নেই, ঠিক কিনা বলুন ?

দয়াময়বাবু তপতীর কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন।

তপতী একটু দম নিয়ে বলল—আপনি বিনয় মাস্টারের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কুৎসা রটনা করে তাকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করেছেন। শুধু তাই-ই নয়, অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার যে মহৎ কাজে সে ব্রতী হয়েছিল—ব্যক্তি-গত স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনি ও আপনার ছেলে অপপ্রচার চালিয়ে তার সেই কাজের বাধা সৃষ্টি করেছেন, এতখানি নীচ প্রবৃত্তি আপনাদের ? পারবেন বলতে সেদিন কি কারণে আপনি সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে ছিলেন ? বাবা আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে গেছেন এত মিথ্যা কথা আপনি মানুষকে বলে বেড়াচ্ছেন কোন্ উদ্দেশ্যে ? পারবেন কি আমার মতো দুর্বিণীত মেয়েকে আপনারা বশ মানাতে ! আমার বাবার মৃত্যুর সময় যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি উপরে বসে আছেন। আমি তাঁকে ডাকছি। তাঁর সামনে আপনি হলফ্ করে বলবেন, বাবা আপনার ওই লম্পট, মাতাল, গুণ্ডা ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন কিনা ? যার বাবা অমন, ছেলে তো হবেই। আপনার বয়স তো ষাটের কাছে, আপনার স্ত্রী বর্তমান, আপনি জ্ঞানদা পিসিকে কি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ? আপনাদের গুণপনা আর কত বলব বলুন ! আমার বাড়িতে, আমার সামনে, আমার অতিথিকে গায়ে হাত তোলার হুমকি দেওয়ার স্পর্ধা আপনার ছেলে কোথায় পায় ? যাদের খেয়ে-পরে মানুষ হয়েছেন, আত্মসাৎ করে বড়লোক হয়েছেন, তাদের সর্বনাশ করতে আপনাদের একটুও বিবেকে বাধে না ?

রাধাবিনোদবাবু ইতিমধ্যে উপর থেকে নেমে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সবই শুনেছেন। এবার দরজা ঠেলে ভিতরে এসে দয়াময়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন– ছিঃ ছিঃ ছিঃ আপনার মতো মানুষের এই কাজ! আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। তপতী, তুমি সমস্ত ব্যাপারটা পুলিসে জানাও. আমি তোমার স্বপক্ষে আছি। তোমার জন্যই আমি 'ট্রান্সফার' নিয়ে এখানে আসব।

বৃদ্ধ দয়াময়বাবু এইসময় এক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি হাউমাউ করে কেঁদে বলে উঠলেন—মাগো, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এই বুড়ো বয়সে জেলে ঘাঁনি টানার মতো সামর্থ আমার নেই ·····

দয়াময়বাবুর অবস্থা দেখে তপতীর মায়া হল। সে বলল—ঠিক আছে, আপনি এখন বাড়ি যান, আমি ভেবে দেখি কি করতে পারি।

দয়াময়বাবু তপতীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্থির নিশ্বাস নিয়ে বাড়ির পথে হাটা দিলেন।

যাবার সময় রাধাবিনোদবাবু বললেন—দয়াময়বাবু যেমন শিক্ষা পেয়ে গেলেন লজ্জা থাকলে আর কোন ক্ষতি করতে সাহস করবেন না। তবুও মা তুমি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে—আজ আমি আসি।

—কাকাবাবু, আবার আসবেন কিন্তু।

—আসব মা আসব, তোমার বিয়ের সময় তো আসতেই হবে। দেখ বুড়ো হয়েছি বটে কিন্তু খাবার লোভটা এখনও যায়নি।

–কাকাবাবু, আপনি যে কোনদিন সময় করে আসুন, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমার বিয়ে উপলক্ষে খাওয়ার বাসনা করবেন না। কারণ, আমার আদৌ বিয়ে হবে কিনা সন্দেহ আছে, আর যদি হয় তবে তা হবে হঠাৎ এবং

অনাড়ম্বরভাবে; হয়তো বা লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমি আগে-ভাগে ক্ষমা এবং আশীর্বাদ চেয়ে নিচ্ছি। তপতী নিচু হয়ে ডাক্তারকে প্রণাম করল।

ডাক্তারবাবু তপতীর মাথায় ডান হাতখানা রেখে আশীর্বাদ করার পর বললেন—আমি জানি, তুমি এমন কোন অন্যায় করবে না যাতে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমার আশা পূর্ণ করুন।

২৭

ডাক্তারবাবুকে বিদায় দিতে এসে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে তপতী দেখতে পেল অপর্ণা আসছে, সঙ্গে তার মা। তপতী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে উপরে নিয়ে এল। আগামীকাল অপর্ণার বিয়ে। কয়েকদিন আগে বীণাদেবী বিয়ের চিঠি দিয়ে তপতীকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। উপরে গিয়ে তিনি বললেন—মা, এ ক'দিন তুমি একবারও আমাদের বাড়ির দিকে যাওনি। তাই খোঁজ নিতে এলুম আবার তোমার শরীর খারাপ করল কিনা!

—আমার শরীর ভালোই ছিল কিন্তু কয়েকটা ঘটনায় মনটা ভালো ছিল না। আপনারা না এলে আজ এখনই যাব ভেবেছিলুম।

—তারপর মা, কাল তো বিয়ের দিন।

—হ্যাঁ কাকীমা আমার মনে আছে। আমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে রেখেছি।

—মা, আমি টাকার কথা বলিনি। তুমি এ ক'দিন

যাওনি আর অপর্ণা ও লজ্জায় তোমার কাছে আসছে না, তাই দিনটার কথা স্মরণ করিয়ে দিলুম।

তপতী হঠাৎ আলমারী খুলে একটা তুত্‌রঙের বেনারসী বের করে অপর্ণাকে বলল—এটা তোর কেমন লাগে?

অপর্ণা শাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু ভালো-মন্দ কোন মন্তব্য করল না।

বীণাপাণিদেবী বলে উঠলেন—বেশ রঙ, তোমাকে মানাবে ভালো।

তপতী হেসে বলল—এটা আমার নয়, অপর্ণার জন্য কিনেছি। আপনাদের কেনাকাটা সব হয়ে গেছে?

—তা মা একরকম হয়েছে। কিন্তু তোমার কাকাবাবু মেয়ের জন্য কোন বেনারসী কিনতে পারেনি।

এ কথার জবাবে তপতী কোন মন্তব্য না করে শুধু বলল—যাবার সময় কাপড়টা নিয়ে যাবেন।

—আজ কেন নেব? কাল বিয়ের দিন লোকজনের মাঝে তুমি নিজে হাতে করে দেবে।

—না কাকীমা আপনি আজই নিয়ে যাবেন। লোকজনকে দেখিয়ে কিছু করার অভিপ্রায় আমার নেই। তাছাড়া বেনারসী পরে ওর বিয়ে হোক এই আমি চাই। সকলের সামনে দিলে সেটা সম্ভব হবে না।

ওদের যাবার সময় তপতী শাড়ীর প্যাকেটটা অপর্ণার হাতে জোর করে ধরিয়ে দিল।

পরেরদিন সকালবেলা স্নান সেরে এবং জলখাবার খেয়ে তপতী অপর্ণাদের বাড়িতে গেল।

সন্ধ্যার পরে বিয়ের লগ্ন। বরযাত্রীরা সন্ধ্যার আগেই এসে পৌঁছেছে। বনমালীবাবু চারটে হ্যাচাক্ লাইট্ ভাড়া নিয়েছেন। মাইকের পরিবর্তে বাদ্যকার সম্প্রদায় থেকে পাঁচজনের একটা দল এসেছে সানাই, ঢোল ইত্যাদি বাজানোর জন্য। বরযাত্রীরা

আজ রাতে এখানেই থাকবে। সেইমতো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ছেলের মামা নিত্যানন্দবাবু ও বড়দা প্রণব বিয়ের আগেই জিনিস-পত্র সব মিলিয়ে নিচ্ছেন। নগদ টাকার প্রশ্ন উঠতেই তপতী প্রণববাবুকে ডেকে পাঠাল। তিনি এলে তপতী একান্তে ডেকে নিয়ে বলল—পাল বাবু, আপনাকে কয়েকটি কথা বলব, আশাকরি আপনি ধৈর্য্য ধরে শুনবেন।

—বলুন।

—আপনারা নিশ্চয়ই বনমালীবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। অথচ উনি কন্যাদায় গ্রস্থ। কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাবার জন্য অতীতে যেমন অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন উনিও সেইভাবে প্রচুর ঋণ করে সকল জিনিস পত্র জোগাড় করেছেন। অবশেষে নগদ টাকা জোগাড় করার জন্য এমন একটা কাজ করেছেন যাতে তাঁর জীবদ্দশাতে তিনি কোনদিনই ঋণের জাল থেকে মুক্তি পাবেন না।

প্রণববাবু কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—উনি কি করেছেন?

তপতী জবাব দিল—আপনি তা শুনলে অবাক হবেন এবং টাকা নিতে চাইবেন না।

—ঘটনাটা কি বলুন শুনি।

—উনি মাসিক আট টাকা হারে সুদে আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিচ্ছেন। অর্থাৎ উনি আমার কাছে চুক্তিবদ্ধ যতদিন আমার আসল টাকা না পরিশোধ করেন ততদিন মাসে মাসে চারশো টাকা করে সুদ দিয়ে যাবেন। এবার বলুন আসল টাকা দূরে থাক, আমার সুদের টাকাই কি উনি যথা সময়ে পরিশোধ করতে পারবেন?

তপতীর কথা শুনে প্রণববাবু চুপ করে আছেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

তপতী আবার বলল—এই দেখুন আমি টাকাটা এনেও আপনার সঙ্গে একটু কথা না বলে দিতে পারছিলুম না। কারণ, আপনি ভাইকে বিয়ে দিয়ে বনমালীবাবুর আত্মীয় হতে চলেছেন। এরপর বিপদ-আপদে আপনারা নিশ্চয়ই পরস্পরকে সাহায্য করতে আগ্রহী হবেন। বনমালীবাবুর নিষেধ সত্ত্বেও আমি আপনাকে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল—কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে তিনি মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবছেন। আর এই অপরাধ স্খালনের জন্য কর্তব্যের খাতিরে এমন এক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন যাতে তিনি জীবনের বাকী দিনগুলোতে একটুও স্বস্থিতে থাকতে পারবেন না। এখন আপনারা ইচ্ছা করলে তাঁকে এই বিপদের মধ্যে ফেলতেও পারেন, আবার মুক্তিও দিতে পারেন। এই নিন টাকাটা। এইসব শুনে যদি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন তবে কোন কথা নেই। আর যদি তা না পরেন—তবে টাকাটা আমাকে ফেরৎ দেবেন। কারণ, আমি চাইনা মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বনমালীবাবু মস্ত বড এক বিপদের ফাঁদে পড়েন।

প্রণববাবু কোন কথা না বলে টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে চলে গেলেন। তিনি বাইরে গিয়ে বাবা ও মামার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে ফিরে এসে তপতীকে বললেন—আমাদের আর লজ্জা দেবেন না, এ টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন।

—আপনারা ভালো করে ভেবে দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ, আমি চাইনা এই টাকার জন্য আমার আত্মীয় কেউ এমন বিপদে পড়ুক।

—বেশ তবে দিন। তপতী নোটের বাণ্ডিলটা হাতে নিল। বাণ্ডিল থেকে একহাজার এক টাকা প্রণববাবুর হাতে দিয়ে বলল—এই টাকাটা রাখুন। আমার অনুরোধ, আপনার হাত দিয়ে এটা অপর্ণার হাতে যাবে, যাতে ওরা প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীতে খরচ করতে পারে। এ টাকাটা আমি দিচ্ছি; এর জন্য অপর্ণার বাবাকে ঋণগ্রস্থ হতে হবে না।

প্রণববাবু বিনা প্রতিবাদে টাকাটা পকেটে রেখে ধন্যবাদ জানিয়ে বিয়ের আসরে ফিরে গেলেন। অপর্ণার বিয়ে নির্বিঘ্নে সমাধা হল।

সকালবেলা বাড়ি ফিরে গিয়ে তপতী জানালায় বসে আছে। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে গাছের শাখায় শাখায় ফুলের সমারোহ। মৌমাছিরা গুণগুণ স্বরে মধুচয়ণে ব্যস্ত। তাদের বাড়ির কাঞ্চন ফুলে ফুলে ভ্রমরের আনাগোনা। এই পরিবেশে গতরাত্রে অপর্ণার বিয়ের স্মৃতি তাকে বড়ই পীড়ণ করছে। তার যৌবনের সকল সত্ত্বায় আজ যেন নিঃসঙ্গতার হাহাকার বাজছে। সে উদ্ভ্রান্তের মতো তানপুরা টেনে নিয়ে গান ধরল :—

আবার কেন এল ফাগুন
ফুটাইল ফুল বনে।
জ্বালাইল প্রেম আগুন
মোর বিরহী এ প্রাণ মনে ।।
কুসুমে কুসুমে মধু টলমল,
মধুকর মধুকরী হয়েছে পাগল
রূপসী ডালিয়া ঘোমটা খুলিয়া
চেয়ে রহে পথ পানে ।।
হইছে মোর পরাণ উতল,
দখিণাবায়ে প্রণয় উছল ;
এস প্রিয় কর হিয়া শীতল
তব প্রেম বরিষণে ।।

গান শেষ করে তপতী উঠল। বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। জলখাবার খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হল। রাত্রি জাগলেও তার চোখে এখন ঘুম আসছে না। সে চোখ বন্ধ করে অনেক কিছু ভাবল। তারপর আলমারী খুলে কতকগুলো এক'শ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার গন্তব্যস্থল মাজদিয়ার বাজার।

ঘণ্টা তিনেক পরে সে যখন বাড়ি ফিরল তখন দেখা গেল তার হাতে একটা মাঝারি ধরনের নতুন স্যুটকেস।

২৮

আজ রবিবার। আজও বিয়ের তারিখ আছে। সহদেব মণ্ডলের মেয়ের বিয়ে। তপতীর নিমন্ত্রণ ছিল। সে যেতে পারবে না বলে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে। তপতী বাগান থেকে রজনীগন্ধাসহ অন্যান্য ফুল তুলে স্নান করে ঠাকুর ঘরে গিয়ে কিছু ফুল দিয়ে পুজা সারল। বাকী ফুল একটা কলার পাতায় জড়িয়ে বাঁধল। তারপর জ্ঞানদাকে প্রণাম করতে গেলে জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করল—আজ এমন ঘটা করে প্রণাম করছ কেন বল তো?

তপতী জবাব দিল—পিসি, তোমাকে আমি গুরুজনের মতো শ্রদ্ধা করি। তোমার স্নেহ-ছায়ায় এত বড় হয়েছি। আজ একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি, তুমি আমায় আশীর্বাদ কর—যেন সফল হতে পারি!

জ্ঞানদা তপতীর চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল—কখন ফিরবে?

—ঠিক নেই, দেরি হলে কিংবা রাত্রে না ফিরলে তুমি আমার জন্য কোন চিন্তা ক'রো না।

—তুমি কি একা যাচ্ছ?

—হ্যাঁ......

—এসো তাহলে, তোমার আশা পূর্ণ হোক। জ্ঞানদা হাত জোড় করে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ নিয়ে তপতীর জন্য মঙ্গল কামনা করল।

নমী খেয়াঘাট পর্যন্ত তপতীকে এগিয়ে দিল। তপতী নদী পার হয়ে ওপার থেকে রিক্সায় উঠল। বিনয়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে কি মনে করে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে সে হাঁটছে। তার একহাতে স্যুট্‌কেস এবং অন্যহাতে ফুলের প্যাকেট। অবশেষে বিনয়ের বাড়িতে পৌঁছে সে উঁকি মেরে দেখল, বিনয় ঘরের মধ্যে মেঝেয় মাদুর পেতে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একমনে কি যেন লিখছে। তপতী পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে এক ছোঁ মেরে কাগজখানা তুলে নিয়ে দেখল, তারই উদ্দেশ্যে বিনয় চিঠি লিখছে। সে স্যুট্‌কেসটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে বিনয়ের সঙ্গে শুধু একবার দৃষ্টি বিনিময় করে জানালার ধারে সরে গিয়ে চিঠিখানা পড়তে লাগল।

"সুচরিতাসু তপতী,

তুমি যেতে অনুরোধ করেছিলে; কিন্তু আমি যাইনি। বারবার তোমার কাছে গিয়ে যেমন তোমায় বিপদে ফেলেছি, তেমনি নিজেও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। আমি ভালো করে বুঝে দেখলুম তোমার সান্নিধ্যে গিয়ে অনেক বেশি পীড়ণ করা হয়েছে, আর নয়। আমি যদি ওখানে না যাই তাহলে তোমাদের আর বিরোধ থাকবে না। হৃদয়বাবু আমার প্রতি যে আচরণ করেছেন তাতে তুমি কোন দুঃখ পেয়ো না। আমি মনে মনে তাঁকে ক্ষমা করেছি। আসলে তিনি তোমাকে বেশি ভালোবাসেন—সেই ভালোবাসার আবেগেই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন এই যা!

নানা কারণে আপাতত আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। জানি না আর ফিরে আসা হবে কিনা। যদি না আসি তবে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ, তুমি পুব-পাড়ায় সেলাই স্কুল ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কেন্দ্র খোলার যে শপথ নিয়েছিলে তা পালন ক'রো। আমার উদ্যোগ বিফল হলেও

আমি আশা রাখি, তুমি কৃতকার্য্য হবে। তুমি চাইলে হৃদয়বাবু বা তার বাবা তোমাকে সাহায্য করবেন।

আমার চিঠি শেষ করার আগে আর একটা কথা যোগ করছি। তা হল, তোমার ধারণাই ঠিক—আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি। তাই তোমার ভালোবাসার দাবীদার হবার অধিকারও আমার নেই।

চিঠিখানা পড়া শেষ হলে তপতী তা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে দরজার খিল তুলে দিল। তারপর অশ্রুসজল চোখে বিনয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—এত আজেবাজে কথা লিখেছ কেন? আমাকে দুঃখ দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না, না?

বিনয় জবাব দিল—যা সত্যি তা ব্যক্ত করায় যদি তুমি দুঃখ পাও তবে আমার কি করণীয় আছে তা তো ভেবে পাচ্ছি না।

—করণীয় তোমার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তুমি কিছুতেই আমাকে সহজ করে বুঝছ না।

—দেখ এসব কথা এখন অবাস্তর, উচিৎও নয়।

—কেন বল তো?

—কারণটা তুমি নিশ্চয়ই জানো!

—দেখ তুমি কার কাছে কি শুনেছ জানিনা, তবে যদি কিছু শুনে থাক তা আদৌ সত্যি নয় হৃদয়নাথ বা তার বাবা অনেককে বলে বেড়াচ্ছে আমার বাবা নাকি হৃদয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে গেছেন। এর পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে তা তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। তবে তা হবার আগে অন্য কিছু না জুটুক অন্ততঃ একটুখানি দড়ি জুটবে, এ আমি বিশ্বাস রাখি।

বিনয় মাথা নত করে বসে রইল। তপতীর কথার 'পরে সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না।

তপতী আবার বলে উঠল—এবার আমার কথা শুনে কিছু বিশ্বাস করবে? বল তো চেষ্টা করলে অন্য কোথাও আমার বিয়ে

হত না কি ? আমার যদি অন্য কাউকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যই থাকত তাহলে এতগুলো বছর প্রতীক্ষা করে সয়ম্বরা হলুম কেন ? তুমি বোধ হয় আমার কথা কিছুই বুঝতে পারছ না ? তাহলে মনে করার চেষ্টা কর কলেজের দিনগুলোর কথা, আমার জন্ম-দিনের কথা। আমি সব ঘটনার উল্লেখ করতে চাইনা—শুধু মনে কর, ভৈমী একাদশীর সকালে রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে যা ঘটেছিল তার কথা। এরপরও আমার উপর তুমি অন্য কারো অধিকার বলে ভাবতে পার ? তা যদি ভাব তবে তোমাকে কোনই দোষ দেব না, এ আমারই কর্ম ফল। আশা রাখি এর প্রায়শ্চিত্ত করাব জন্য চূর্ণীর জল এখনও শুকিয়ে যায়নি। তপতী শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দরজার দিকে পা বাড়াল।

বিনয় তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে বলে উঠল—না না তপতী, অমন ছেলেমানুষী ক'রো না। আমি সব বুঝেছি এবং বিশ্বাসও করেছি। সে কাঁধের উপর তপতীর মাথাটা নিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে পুনরায় বলল—বল আমি এখন কি করতে পারি ?

তপতী কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করে অবশেষে সংযত হয়ে বলল—আমি নিঃস্ব হাতে ফিরে যাব না বলেই তোমার কাছে এসেছি। ওই স্যুটকেসটা খুলে দেখলেই সব বুঝতে পারবে।

বিনয় তপতীকে ছেড়ে দিয়ে স্যুটকেস খুলে দেখল ওর মধ্যে নতুন ধুতি, পাঞ্জাবী, শাড়ী. শাঁখা, সিঁদুর ইত্যাদি বিয়ের অনেক কিছু উপকরণ রয়েছে। বিনয় একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলে—তপতী তোমার এই মহান উদ্দেশ্যকে আমি কি করে বাস্তবে রূপ দেব তা ঠিক এই মুহূর্তে ভেবে পাচ্ছি না। আমি এখন সম্পূর্ণ বেকার, আমি মাস্টারীটা বিশেষ কারণে ছেড়ে দিয়েছি।

—সে আমি জানি।

—তা হলে ?

—ভাবছ না খেয়ে মরবে? মনে রেখ তোমার সম্পত্তি বা অর্থে যদি আমার অধিকার জন্মায় তা হলে আমার সম্পত্তি বা অর্থেও তোমার তেমনই অধিকার আছে। ভাগ্যক্রমে আমি একেবারে নিঃস্ব নই।

—কিন্তু তোমার অর্থ আমি ব্যক্তিগত ভোগবিলাসে নষ্ট করব কোন্ মুখে বল তো?

—বিনয়, তুমি তর্ক বাড়িয়ো না। আমি জানি তুমি কর্মবিমুখ নও। তোমার বেকারত্বও চিরদিন থাকবে না। সব মানুষের জীবনেই কোন না কোন সময় দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। আর্থিক অনটনও একটা দুর্যোগ। প্রয়োজনে তাই অনেক সময় ধার করতে হয়, আবার সুযোগ মতো তা পরিশোধ করেও দিতে হয়। আমার অনুরোধ, যতদিন তোমার আর্থিক সমস্যা দূর না হয় তুমি ধার মনে করেই নূনতম যতটুকু প্রয়োজন আমার টাকা খরচ ক'রো। যখন সুদিন আসবে তখন আবার ফিরিয়ে দিও—তা আমাকেই হোক আর অন্য কোন অভাবী মানুষকে সাহায্য করেই হোক। তাই বলে কোন অজুহাতে আমাকে ফিরিয়ে দিওনা প্লীজ! বিশ্বাস কর, আমার একা থাকার অনেক বিপদ—আর আমি তা থাকতেও চাই না।

ঠিক এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। একবার নয় বারবার। বিনয় কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তপতী তাড়াতাড়ি স্যুটকেস গুছিয়ে লুকানোর চেষ্টা করছে। এবার ব্রজবাবুর গলা পাওয়া গেল। বেশি দেরি হলে পাছে তিনি অন্য কিছু মনে করেন তাই বিনয় দরজার খিল খুলে দিল।

ব্রজবাবু ঘরে ঢুকে হঠাৎ পিছনে সরে এসে বললেন—ভাই আমাকে ক্ষমা ক'রো, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এমন সময় এসে পড়ব। তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম—স্কুল কমিটি তোমার "রেজিগ্নেশন" গ্রাহ্য করেনি। তুমি কাল থেকে যথারীতি ক্লাস নেবে। পাছে তুমি বিশ্বাস না কর, তাই নিজে এসেছি। তোমাদের বিরক্ত করায় আমি খুবই দুঃখিত।

ঠিক তখনই বিনয় অবাক হয়ে দেখল তার পিসিমা সপরিবারে আসছেন। সে উঠানে নেমে গিয়ে পিসি ও পিসেমশাইকে প্রণাম করে পারুলকে জিজ্ঞাসা করল—তোরা কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ এভাবে চলে এলি যে?

পারুল মুখিয়ে জবাব দিল—কেন তোমার অনুমতি না নিয়ে এখানে আসা যাবে না নাকি? তাহলে সে কথা চিঠিতে লিখে দিলেই পারতে!

—হ্যাঁরে বিনয়, তোর কি হয়েছে বল তো? তুই চিঠিতে অমন সব কথা লিখেছিস কেন? কথাগুলো বলতে বলতে চপলাদেবী ঘরে ঢুকলেন। তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়ানো তপতী ও বিনয় এবং মেঝেয় মাদুরের উপর বিয়ের দ্রব্য সামগ্রী দেখে পুনরায় বললেন এ কিরে, লুকিয়ে লুকিয়ে তোরা কী আরম্ভ করেছিস? ভাগ্যিস এসে পড়েছি, নইলে কিছুই যে জানতে পারতুম না! কিন্তু বিয়ে বাড়িতে আর লোকজন কই? বিয়ের অন্যান্য জোগাড় কই? তোর শ্বশুরের খরচ বাঁচানোর জন্য তোরা এইসব ফন্দি এঁটেছিস!

লজ্জায় তপতীর মাথা কাটা যাচ্ছে। বিনয় বলল—পিসি, তুমি এখন একটু চুপ কর, আমি তোমাকে সব কথা পরে বলব। ব্রজবাবু যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি বিনয়কে ডেকে গুটিকয়েক প্রশ্ন করে আসল ঘটনা জেনে নিয়ে বললেন—ঠিক আছে ভাই তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি এখনই মাস্টারমশাইদের এবং ছেলেদেরকে খবর দিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। আর পুরুতের কাজটা না হয় আমিই করব। পইতেটা যখন গলায় আছে তখন পুঁথি-পাজি দেখে কাজটা ঠিক চালিয়ে নেব। আমি একটু ঘুরে আসছি ভাই। তিনি বিবাহের বাকী সব যোগাড় করতে বেরিয়ে গেলেন।

—ঃ সংশোধনী ঃ—

পৃষ্ঠা	ভুল	ঠিক
৩	ঘণ্টার বাজা	ঘণ্টা বাজার
৭	সৃষ্টিকে	দৃষ্টিকে
১২	অনুমাযী	অনুযায়ী
১৭	দিব	দিল
২২	জীবনে	জীবনের
৪৯	কল্যাণী বিদ্যালয	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
৫০	মাঝে	মাঝে মধ্যে
৫০	এম এ	এ-এস সি
৫৩	থে	যে
৫৩	কোম্পনৌ	কোম্পানী
৬৫	শঙ্খধ্বনি	শঙ্খধ্বনি
৮৪	কামাক্ষা	কামাখ্যা
৯৫	দিল	দিলেন
১০৪	না	নাহয়
১১২	নিশ্চন্ত	নিশ্চিত
১১৩	দিলকাল	দিনকাল
১২৮	বাড়িতে	বাড়িতে
১৩১	ঘুমেয়	ঘুমের
১৪০	হাওয়ার	যাওয়ার
১৪৯	বাব-বেটার	বাপ বেটার
১৫২	নিশ্চিন্ত	নিশ্চিত